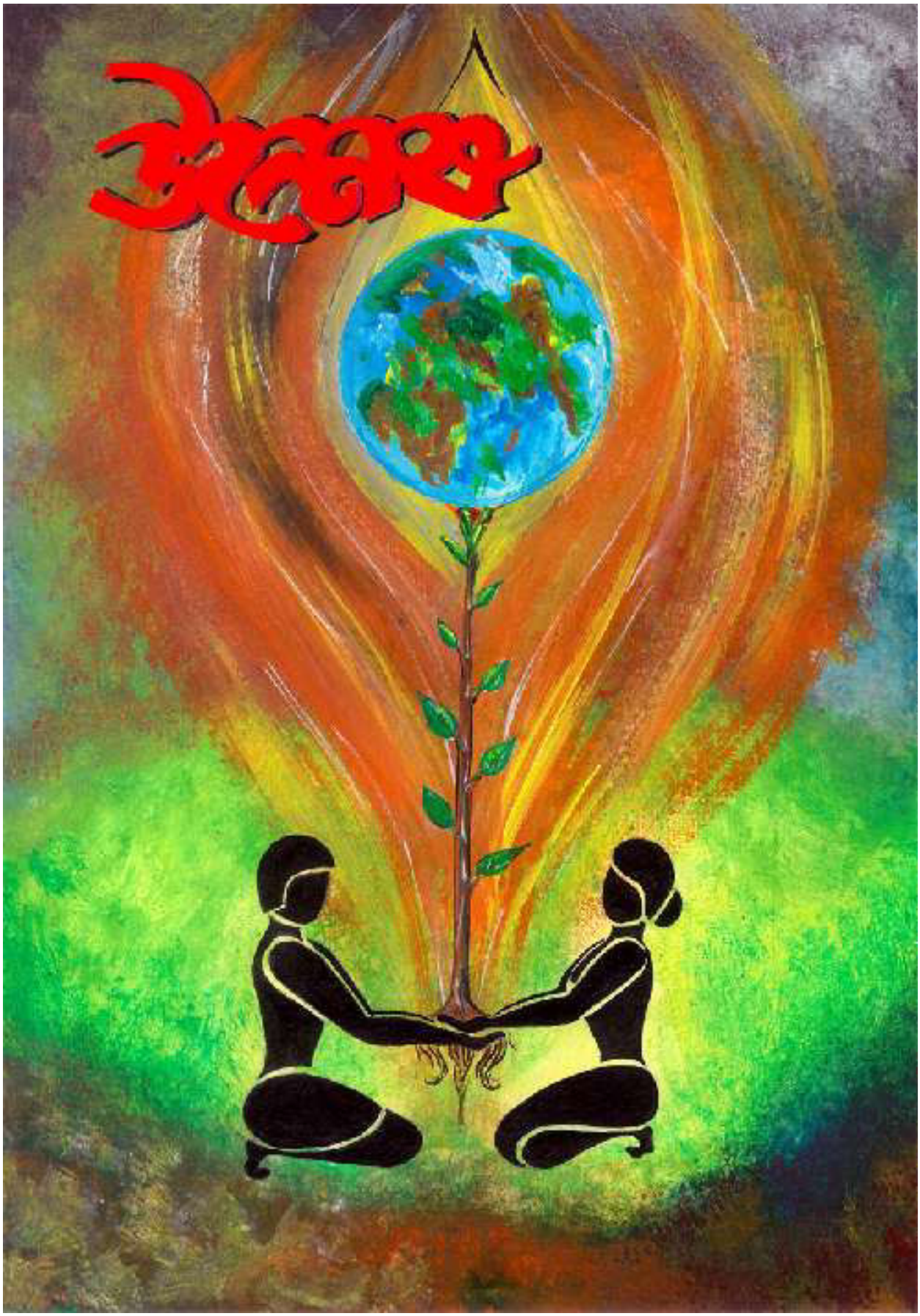
पेलवश

প্রচ্ছদ - শ্রী মতিলাল গোস্বামী

উন্মেষ

প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর ২০২৩ খ্রীঃ

'উন্মেষ' প্রকাশদল ঃ

সভাপতি - স্বপন কুমার ভট্টাচার্য
সহ সভাপতি - ডাঃ অভিজিৎ দত্ত
সহ সভাপতি - পার্থপ্রতিম সাহা
আহ্বায়ক - অমিতাভ দাশ
যুগ্মআহ্বায়ক - দীপঙ্কর শূর

সদস্য/সদস্যা - স্বপন সাহা
- মানস কুমার রায়
- টিংকু দেবনাথ
- উমা রায়

অলংকরণ - জাকির, অমিতাভ, দীপঙ্কর
অক্ষর বিন্যাস - জাকির হোসেন
মুদ্রণ - জে.কে. গ্রাফিক্স, উদয়পুর।
৯৮৫৬৬৮৭৬২২
৮২৫৭০১৯৯৫৬

প্রকাশক - পার্থপ্রতিম সাহা
সম্পাদক
হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা,
উদয়পুর শাখা, গোমতী জেলা।

প্রকাশনা সহযোগী - সাউথ জোনাল কমিটি (এইচ্.এফ.টি)।

প্রথম প্রকাশ - ১৯ অক্টোবর ২০২৩ খ্রীঃ

'উন্মেষ' অঞ্জলি

মেঘভাঙ্গা বৃষ্টি, হড়পা বান, ক্রিকেটযুদ্ধ, মণিপুর, ড্রাগস, ভোট, ইজারায়েল-প্যালেস্টাইন। সাম্প্রতিক সামাজিক মাধ্যম থেকে চায়ের দোকান। দিনভর সরগরম বিতর্ক, যুক্তি আর পাল্টাযুক্তিতে। নিছক ভাল, নিছক মন্দ, সবাই সৎ, সবাই অসৎ প্রাত্যহিক জীবনে এমনটি হয়না, হতে পারেনা। হয় এদিক নয় ওদিক। সাদা আর কালো, দিন আর রাত পালন আর শাসন, সৃষ্টি আর সংহার এমনই চলছে, চলবে। সাহিত্যে এভাবেই সমাজ ও জীবন প্রতিফলিত হয়। শারদ আয়োজনে সেই বিচিত্র ভাবনার উন্মেষই তাড়িত করেছে লিখতে।

সামাজিক, স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা কর্মসূচীর মাঝে এবারই প্রথম 'উন্মেষ' শারদ সাহিত্যের। সাধ আর সাধ্যের টানাপোড়েনে এই গুরুভার দায়িত্ব পালন কতটা সুচারু হয়েছে জানা নেই। মূল্যায়ণের দায়িত্ব ভাবীকালের। দেবীর চরণতলে পুষ্প, নৈবেদ্যের সঙ্গে এই অর্বাচীন সাহিত্য অর্ঘ্যই আমাদের অঞ্জলি।

বিনীত
উন্মেষ প্রকাশদল।

—ঃ সূচী পত্র ঃ—

প্রবন্ধ

১।	এগিয়ে চলাই জীবন	-	স্বামী শান্তিঘনানন্দ	১-২
২।	পুজোর গান, গানের পুজো	-	সুবিমল ভট্টাচার্য	৩-৪
৩।	উৎসব ও প্রশাসন	-	পঙ্কজ চক্রবর্তী	৫-৬
৪।	দুর্গোৎসবে ভুরিভোজ	-	ডাঃ পার্থ প্রতীক রায়	৭-১০
৫।	উৎসবের জাঁকজমক ও শিশুর স্বাস্থ্য	-	ডাঃ গোপা চ্যাটার্জী	১১-১২
৬।	আরক্ষা কর্মীর ভাবনায় দুর্গোৎসব	-	প্রনব সেনগুপ্ত	১৩-১৪
৭।	পাখীসব করে রব উৎসব আসিল!	-	পার্থ সারথি চক্রবর্তী	১৫-১৭
৮।	একাত্তর সালের দুর্গাপুজো : দেবী দুর্গার ত্রিশুলে ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি	-	স্বপন ভট্টাচার্য	১৮-১৯
৯।	মা দূর্গা, শিড়দাঁড়াটা শক্ত করে দাও	-	ডাঃ প্রদীপ ভৌমিক	২০-২১
১০।	শারদোৎসব যেন আলোর উৎসব	-	দীপক লোধ	২২
১১।	আনন্দময়ীর আগমন ও কাঙালিনী কথা	-	মনিদীপা কর্মকার	২৩-২৪
১২।	মহাকাশ চর্চা দীর্ঘায়িত করুক মানব সভ্যতার আয়ু!	-	সোমনাথ চক্রবর্তী	২৫-২৭

ছোটগল্প/অণুগল্প

১।	হাজী সাহেব	-	অরিন্দম নাথ	২৮-২৯
২।	যোগমায়া আলো	-	নন্দিতা দত্ত	৩০-৩১
৩।	ঝিন্টির শেষ চিঠি	-	সুভাশিষ চৌধুরী	৩২

রোমন্থন

১।	একদা নবমী নিশি	-	সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী	৩৩-৩৪
২।	অনি	-	কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী	৩৫-৩৬
৩।	সীমান্ত শৈশব	-	সুব্রত মজুমদার	৩৭-৩৮
৪।	কোজাগরী লক্ষ্মীর সাতকাহন	-	বর্ণালী দাশ বন্দোপাধ্যায়	৩৯-৪০
৫।	ভিন্ন আলো	-	মনীষা সাহা	৪১-৪২
৬।	মনে পড়ে তব মুখখানি	-	অমিতাভ দাশ	৪৩-৪৪
৭।	গ্যাঁড়াকল	-	সুখ চন্দ্র মুড়াসিং	৪৫

কবিতা

১।	ধরে নিয়ে যাবে কোটালে	-	মিহির দেব	৪৬
২।	তিনটি কবিতা	-	দিলীপ দাস	৪৬
৩।	ভুলাই নাই যাইস	-	বিপ্লব ঊরাং	৪৭
৪।	চলে যাওয়ার পর	-	অপন দাস	৪৭
৫।	স্বপ্ন রং-ধনু	-	স্বপন মজুমদার	৪৮
৬।	আমার আগময়ী	-	ডঃ দেবযানী ভট্টাচার্য	৪৯
৭।	যে মাটি ভিজেছে রক্তে	-	গোপা দত্ত	৫০
৮।	পথ	-	লক্ষ্মন কুমার ঘটক	৫০
৯।	স্মৃতিকথা	-	আশীষ চট্টোপাধ্যায়	৫১
১০।	আজ যানে কী জিদ না করো	-	রাহুল সিন্‌হা	৫১
১১।	ফলশ্রুতি	-	সুব্রত তলাপাত্র	৫২
১২।	দেবী শোধন	-	বিমল বনিক	৫২
১৩।	আগমনী	-	মনোজিৎ ধর	৫৩
১৪।	দুধপুষ্করিনী মৌজা হতে মেদিনীপুর	-	মৃদুল দেবরায়	৫৩
১৫।	ধান গাছ	-	সুমন পাটারী	৫৪
১৬।	দাগ	-	দীপ্সি দে	৫৪
১৭।	বিবর্তন	-	সংকর্ষণ ঘোষ	৫৫
১৮।	সূত্রপাত	-	অনিরুদ্ধ সাহা	৫৫
১৯।	সুবোধ	-	রাজীব মজুমদার	৫৬
২০।	আলোর আবাহন	-	বিপাশা চক্রবর্তী	৫৬
২১।	আমরা ভাল নেই	-	সঞ্জীব চক্রবর্তী	৫৭
২২।	কথা	-	খোকন সাহা	৫৭
২৩।	উৎসব	-	কল্যানী ভট্টাচার্য	৫৮
২৪।	বাইশ কথা	-	পার্থপ্রতীম চক্রবর্তী	৫৮

হেপাগাথা

১।	দুর্গাপুজো ও সম্প্রীতির পাহাড় সমতল	-	প্রানময় সাহা	৫৯-৬০
২।	আমাদের উৎসব	-	ডাঃ অভিজিৎ দত্ত	৬১
৩।	উৎসবের আলো	-	পার্থপ্রতিম সাহা	৬১
৪।	টেলি মানস	-	ডাঃ উদয়ন মজুমদার	৬২
৫।	মোবাইলগ্রস্থ আজকের শিশুকিশোর	-	ডাঃ সঞ্জয় আইন	৬৩
৬।	আমার চিন্ময়ী মা (কবিতা)	-	কার্তিক দেবনাথ	৬৪
৭।	আগমনী (কবিতা)	-	সুব্রত আচার্য	৬৪
৮।	রাজধানীর বনেদি পুজো	-	দেবী চক্রবর্তী	৬৫
৯।	উৎসব ও কাঁটাতার	-	স্নেহাশীষ চক্রবর্তী	৬৬
১০।	কিশোরী বিবাহ এবং গর্ভাবস্থার ক্ষতিকারক প্রভাব	-	ডাঃ অর্জুন সাহা	৬৭-৬৮

এগিয়ে চলাই - জীবন

স্বামী শান্তিঘনানন্দ
বিবেক নগর, আমতলী।

উচ্চ আদর্শ সামনে রেখে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ক্রমাগত - "এগিয়ে চলাই -জীবন"। স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র দেশবাসীর জন্য - বিশেষ করে দেশের যুবসমাজের জন্য বলেছিলেন - "ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌছানো পর্যন্ত থেমো না"।

স্বামীজি আরো বলেছিলেন - "এগিয়ে চলো" কথাটি আমরা সবাই জানি, বহুবার শুনেছি, পড়েছি এবং কথায় কথায় অনেকবার এই কথাটি আমরা বলিও।

কিন্তু, এই- "এগিয়ে চলো" কথাটি একটু ভালো করে চিন্তা করলে কতগুলো প্রশ্ন আমাদের মনে আসে। প্রশ্নগুলি হল - "এগিয়ে চলো" বলতে কী বোঝায়! কোন দিকে আমরা এগিয়ে যাব! এগিয়ে চলার লক্ষ্য কি এবং এই এগিয়ে চলার জন্য পথ কোথায়?

বর্তমান সময়ে সমাজের গ্রামে, শহরে সর্বত্র এগিয়ে চলার আহ্বান শোনা যায়! কিন্তু, লক্ষ্য বা পথের কথা না বলে - শুধু "এগিয়ে চলো" বললেই হবেনা। তাই দেশের যুবকরাও বিভ্রান্ত। কোনটা সঠিক রাস্তা কে বলে দেবে তাদের? তাই, আজ তারাই সবথেকে বেশি - "দিশাহীন"।

স্বামী বিবেকানন্দের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব যুবকদেরই বেশি ভালবাসতেন। বিষয়ী লোকেদের সঙ্গ - তাঁর কাছে বিষবৎ হয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যারতির সময় কুঠিবাড়ির ছাদ থেকে চিৎকার করে ডাকতেন - "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, , আয়"। ক্রমে ক্রমে যুবকরা তার কাছে আসতে লাগলো। শ্রীরাম কৃষ্ণদেবের চোখে যুবকরা ছিল - "নতুন হাঁড়ি"। যা আগে কখনো ব্যবহার হয়নি। সে হাঁড়িতেই কেবল ভালো দই পাতা যায়।

নবেন, রাখাল, তারক, কালি, বাবুরাম, শশী, শরৎ প্রায় সবাই ছিল যুবক, তাঁর সন্তান, তার পার্ষদ। তাদের না দেখে তিনি থাকতে পারতেন না। তার কাছে অনেক পন্ডিত মানুষ আসতেন তাঁকে দেখতেন - কিন্তু যুবকরাই ছিল তাঁর কাছে সবথেকে প্রিয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন চির যৌবনের প্রতীক। তিনি তো চল্লিশ পেরোননি। তাই তিনি চির তরুণ। স্বামীজি বলতেন দেশের যুবকরাই আসল শক্তি। তিনি বিশ্বাস করতেন -যেকোন সমাজের যুবকরাই - আসল সম্পদ।

স্বামীজী চাইতেন যুবকরাই সর্বযুগে, সর্বকালে-নিঃস্বার্থ হবে। তারা দেশের মঙ্গল ও মানুষের মঙ্গল নিয়ে - বেশি চিন্তা করবে।

তাই, স্বামী বিবেকানন্দ শুধুমাত্র -এগিয়ে চলতে বলেই থেমে থাকেননি-তিনি আরো বলেছেন - "ওঠো জাগো লক্ষ্যে না পৌছানো পর্যন্ত থেমো না। এগিয়ে চলাই তোমার ধর্ম"।

স্বামীজী আরও বলতেন - "লক্ষ্য ঠিক রেখে এগিয়ে চলো"। এখন প্রশ্ন হল - এই লক্ষ্য-টা কি?

এর উত্তরে স্বামীজী বলতেন - "তোমার নিজের ভিতরে যে পূর্ণতা - প্রথম থেকে বিদ্যমান, তুমি এতকাল যার সন্ধান পাওনি, তার বিকাশ সাধন করাই-তোমার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে যতদিন না উপনীত হচ্ছ - ততদিন থেমো না"।

স্বামীজী আমাদের পথের সন্ধান দিয়েছেন। আমাদের লক্ষ্য হবে শত প্রলোভন, শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও

সেই পথে এগিয়ে যাওয়া। সেই শ্রদ্ধা, ভালবাসা নিয়েই আমরা এগিয়ে যাব। আমরা অন্তর থেকে এই পথকে, এই লক্ষ্যকে যদি গ্রহণ করি, তবে কেউই আমাদের এ পথ থেকে টলাতে পারবে না। লক্ষ্য স্থির রেখে যদি আমরা ক্রমাগত এগিয়ে চলতে পারি - তবে আমরা সফল হতে পারব।

প্রকৃতপক্ষে সময় কখনো থেমে থাকে না। কালের গতিতে ক্রমশ আমরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে - "মানুষ্যজীবন অতি দুর্লভ"। এই দুর্লভ মনুষ্য জীবনকে যদি আমরা হেলায় হারাই, যদি শুধু স্বার্থসিদ্ধির জন্য, যদি কেবলমাত্র সুখের পিছনে ছুটি, তবে এ জন্ম বিফলে যাবে।

স্বামীজী বলেছেন - "ধর্ম এমন একটি ভাব - যা পশুকে মনুষ্যত্বে ও মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে"। বলেছেন - "ধর্ম মানে শুধু মতবাদ নয়, ধর্ম মানে সাধনা। সৎ হওয়া আর সৎকর্ম করা - এই দুয়ের মধ্যেই সমগ্র ধর্ম"।

বর্তমান সময়ে বহু মানুষ - তাদের সুবিধার্থে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনকে তাদের মতো করে ব্যাখ্যা করছেন। কিন্তু, আমাদের সচেতন থাকতে হবে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব থেকে আমরা যেন সরে না যাই। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য আমরা যদি ঠিক ঠিক অনুসরণ করি, তবে - আমরা কখনোই সঠিক পথ থেকে সরে আসবো না!

আর, সেই সঙ্গে স্বামীজীর আদর্শ আমরা যদি দৈনন্দিন জীবনে সঠিকভাবে মেনে চলি, তবে- আমরা দৈনন্দিন জীবনে ক্রমাগত উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারবো।

যা সত্য তা চিরকালই আকাশে সূর্যের মতো প্রতিভাত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের ভাব তেমনি এক শ্বাশত-যা চিরকালই মানুষকে সত্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ জীবনে গ্রহণ করে "শিব জ্ঞানে জীব সেবা" অর্থাৎ "মানুষের সেবায়" এই জীবন অতিবাহিত করাই হোক-আমাদের জীবনে এগিয়ে চলার মূল লক্ষ্য।

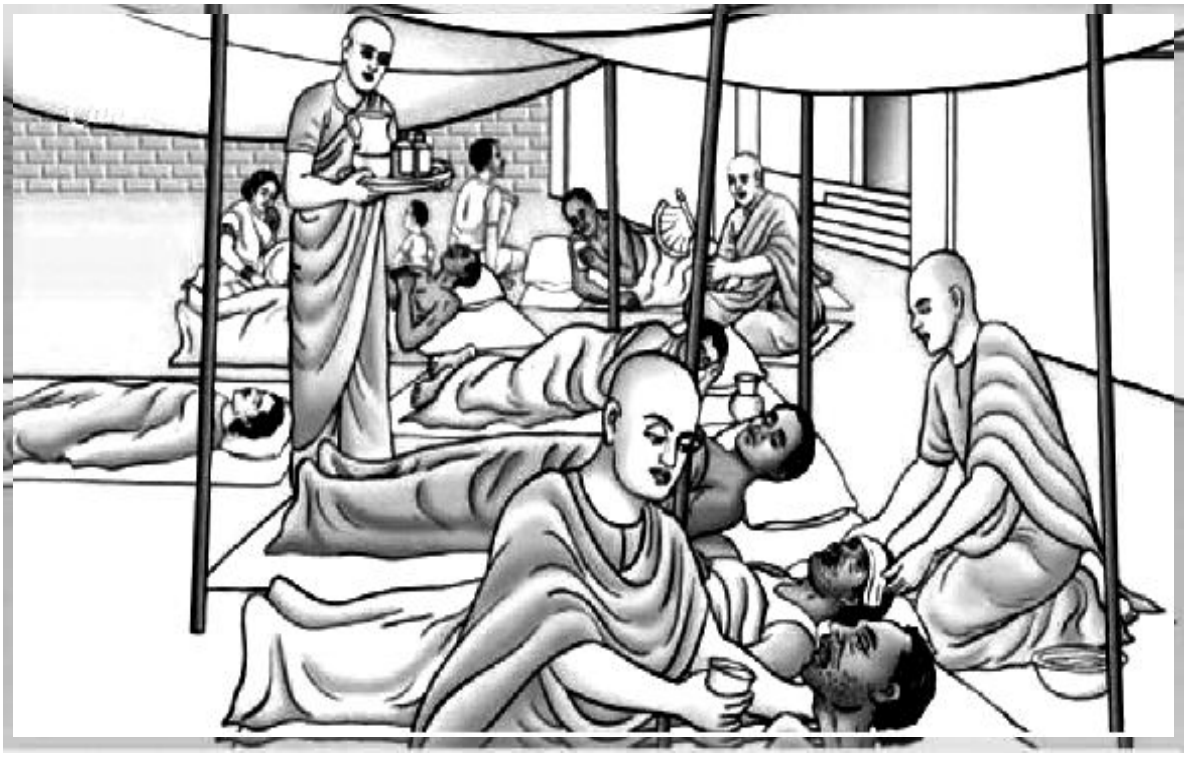

পুজোর গান - গানের পূজা

— সুবিমল ভট্টাচার্য
কোলকাতা।

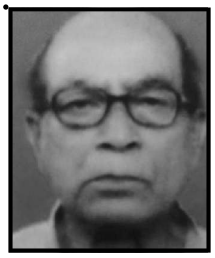

পুজো এলেই নীল আকাশ হাতছানি দেয়। তাতে সাদা মেঘের দল ভেসে বেড়ায়। শিউলি ফুলের রাশি সবুজ ঘাসের বুকে ছড়িয়ে পড়ে। নদী তীরে সোনালি রোদে কাশবন দুলে ওঠে। নগরজীবনেও প্রকৃতি একটু নতুন সাজে সেজে ওঠে। আনন্দময়ী মায়ের আগমনে সবার মুখে হাসি ফোটে। কিন্তু যে কারণে মন খারাপ লাগে তা হল 'পূজোর গান' আর শুনতে পাই না। আগেকার দিনে পুজোয় প্রকাশিত নতুন নতুন গান ছাড়া শারদীয়া উৎসবের কথা কল্পনাই করা যেত না। সঙ্গে ছিল 'সারদ অর্ঘ্য' নামক প্রকাশিত গানের সচিত্র শোভনীয় একখানি পুস্তিকা।

পুজো উপলক্ষে গ্রামোফোন রেকর্ডের গানের ডালি আমরা হারিয়ে ফেলে নিঃস্ব হয়েছি। বাঙালি সমাজ তার চিরন্তন সম্পদ যদি কিছু হারিয়ে থাকে তা অবশ্যই পুজোর গান। সেই সময়টা ছিল বাংলা গানের স্বর্ণযুগ। সে যুগে এমন সব কালজয়ী গানের সৃষ্টি হতো, যা দুর্গাপুজো উৎসবের পরিমণ্ডলকে প্রাণবন্ত করে তুলত। এই প্রজন্মের সবাই অবাক হবেন যে, আমাদের কৈশোর যৌবনে এমন কী মধ্য বয়সের শেষ লগ্নে পৌঁছেও আমরা দেখেছি যে, পুজোর জন্য নতুন নতুন পোশাক পরিচ্ছদ ও গৃহসজ্জার নানা উপকরণের সঙ্গে পরিবারের সকলের জন্য যে সামগ্রী বিশেষভাবে সংগ্রহ করা হতো, তা হল পুজো উপলক্ষে প্রকাশিত নতুন নতুন গানের গ্রামোফোন রেকর্ড। এখানে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, গ্রামোফোন রেকর্ড কিন্তু আধুনিক যুগের সিডি নয়। বাংলা গানের প্রতি মমত্ববোধের পরিচায়ক হিসেবে তখনকার দিনে একটি বিজ্ঞাপনী প্রচারের কথা খুব প্রচলিত ছিল — 'সুখী গৃহকোণ / শোভে গ্রামোফোন'। একথা সর্বাংশে সত্যি যে অধিকাংশ সঙ্গীতপ্রেমী ও সংস্কৃতি মনস্ক পরিবারে বিলাসিতার উপকরণ তেমন কিছু না থাকলেও একটি গ্রামোফোন (সেকালের ভাষায় কলের গান) অবশ্যই থাকত। আর যাদের বাড়িতে গ্রামোফোন বা পরবর্তী কালের রেকর্ড প্লেয়ার ছিল না তারাও তাদের পছন্দ মতো প্রিয় শিল্পীর রেকর্ড কিনে নিয়ে যার বাড়িতে রেকর্ড প্লেয়ার আছে, তার বাড়িতে গিয়ে সেসব রেকর্ডের গান বাজিয়ে শুনতেন। তাতে কোনো লজ্জা বা সংকোচ ছিল না। তাছাড়া সেখানে প্রিয়জনকে রেকর্ড উপহার দেওয়ার রীতিও প্রচলিত ছিল। তরুণ-তরুণীদের মধ্যে একান্ত প্রিয়জনকে গোপন উপহার হিসেবে পুজোর গানের রেকর্ড উপহার ছিল অনবদ্য সামগ্রী। এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি গত শতাব্দীর ষাটের দশকে শ্যামল মিত্রের গাওয়া 'তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলাঘর / হাসি আর গানে ভরে তুলব / যত ব্যথা দুজনে ভুলবো' এবং মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি' গান দুটি শ্রোতাদের মনে এমন আলোড়ন তুলেছিল, যে তখনকার প্রেমিক-প্রেমিকারা ভালবাসার স্মারক হিসাবে রেকর্ড দুটি (একই বছর প্রকাশিত নয়) সংগ্রহ করার বিপুল চাহিদার দরুন রেকর্ডের দোকান থেকে প্রথম কিস্তিতেই রেকর্ডগুলি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সে যুগে প্রেমের প্রকাশ ছিল সঙ্গীতময় ও স্নিগ্ধ। এ যুগের মতো উদ্দাম ও শালীনতা বর্জিত নয়।

তখন বাঙালিরা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন আর পুজোর শারদীয়া সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্ভারে তৃপ্ত হতেন। আর শ্রোতাদের মধ্যে জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্য সঙ্গীত শিল্পীরাও পাল্লা দিয়ে ভাল ভাল গান পুজোর উৎসবের জন্য রেকর্ড করতেন। সেইসব স্বনামধন্য শিল্পীদের নাম স্মরণ করতে গিয়ে আজও আমরা গর্ব বোধ করি। কাকে বাদ দিয়ে কার নাম উল্লেখ করব? তবু বেশ কয়েকটি নাম উল্লেখ করতে প্রয়াসী হলাম।

আধুনিক গানে জগন্ময় মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শচীন দেববর্মন, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, অখিলবন্ধু ঘোষ, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর সেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্তী, সুপ্রকাশ চাকী। আধুনিক গানে মহিলা শিল্পীদের মধ্যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়ত্রী বসু, ইলা বসু, সুপ্রীতি ঘোষ, নির্মলা মিশ্র, আরতি মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতী হোমচৌধুরী, হৈমন্তী শুক্ল, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোসলে ও বনশ্রী সেনগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

পদাবলী কীর্তনে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারডি গানে (ব্যাঙ্গগীতি) মিন্টু দাশগুপ্ত, লোকসঙ্গীতে নির্মলেন্দু চৌধুরি, অমর পাল, পূর্ণদাস বাউল এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতে সাগর সেন, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও সুমিত্রা সেন তাঁদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। শিশুদের জন্য ছড়া গানের রেকর্ড করতেন সনৎ সিংহ, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্তরা চৌধুরি ও জপমালা ঘোষ। সব শিল্পীর গানেরই বিশেষ কদর ছিল। তাই পূজোর প্যাণ্ডেলগুলিতে পুজোর প্রকাশিত গান বাজানো হতো। দর্শনার্থীরা প্রতিমা দর্শনের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে এইসব সুমধুর গান শুনে তৃপ্ত হতেন এবং অচিরেই গানগুলি মানুষের মুখে মুখেই জনপ্রিয় হয়ে যেত। কয়েকটি গানের কলি উদ্ধৃত করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন কত মধুর ও জনপ্রিয় ছিল সেকালে গান। যেমন — 'মেঘ কালো আঁধার কালো' (হেমন্ত), 'বাঁশ বাগানের মাথার উপর' (প্রতিমা), 'যখন কেউ আমাকে পাগল বলে' (মান্না), 'ও দয়াল বিচার কবে' (অখিলবন্ধু), 'ও তোতা পাখি' (নির্মলা), 'পাষাণের বুকে লিখ না আমার নাম' (সতীনাথ), 'মধুর মধুর বংশী বাজে' (সন্ধ্যা), 'ঝনক ঝনক বাজে' (ধনঞ্জয়), 'অপার সংসাহ নাহি পারাবারু (পান্নালাল), 'চল না দীঘার সৈতক ছেড়ে' (পিন্টু)। পুজোর গানের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হল গানগুলির শাস্বত রূপ। বার বার শুনলেও পুরনো হয় না। ইংরাজিতে 'ওল্ড ইজ গোল্ড' বলে অ্যাখ্যায়িত করা যেতে পারে এগুলিকে। এই প্রসঙ্গে সত্যের খাতিরে দু'কথা নিবেদন করি যা আত্মপ্রশংসা বা আত্মপ্রচার বলে পাঠকগণ মনে করতে পারেন। স্বর্ণযুগের পুজোর গানের অনুসঙ্গে গীতিকার হিসাবে আমার জড়িত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। ১৯৭১ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত আমার রচিত গান প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালেও Cassete ও CD'র যুগেও আরও গান বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশী আমার রচিত গানে কণ্ঠ দিয়েছেন লোকসঙ্গীতের প্রাণপুরুষ অমর পাল। কলকাতার এত নামী গীতিকার থাকতেও আমাকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন ভাটিয়ালী গানের জন্য। ১৯৭৭ সালে তিনটি রেকর্ড কোম্পানী থেকে আমার গান প্রকাশিত হয়েছিল HMV, HINDUSTHAN ও BHARATI Record থেকে যথাক্রমে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের সুরে শ্যামাসঙ্গীত, অমর পালের কণ্ঠে লোকসঙ্গীত ও সুপ্রকাশ চাকী'র কণ্ঠে আধুনিক গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল। এই স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আনন্দের সাথে সাথে বেদনাও বোধ করছি।

আধুনিক মঞ্চে বা নতুন প্রতিভা অন্বেষণের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সেই স্বর্ণযুগের গানগুলিই গাওয়া হচ্ছে। এটা সুখের কথা যে, সেই সব কালজয়ী গান বাদ দিয়ে অন্য কোনো নতুন গান পরিবেশন করে এ যুগের শিল্পীরা তাদের প্রতিভা প্রকাশের ঝুঁকি নিতে সাহস করেন না। পুজোর গান আমাদের স্মৃতির অঞ্জলি। সে যুগের শ্রোতারা সে সব গান খুব ভালবাসতেন এবং সংগীত শিল্পীদের প্রতিও তাদের শ্রদ্ধা ভালবাসার শেষ ছিল না, যা শিল্পীদের প্রাপ্য অর্থ দিয়ে কখনওই বিবেচিত হতো না। পুজোর গানের রেকর্ড সংগ্রহ করতে সকলেই যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন। আড়াই বা সাড়ে তিন টাকার একটা রেকর্ড ভেঙে গেলে রেকর্ড সংগ্রাহকের বুকটাই যেন ভেঙে যেত। ভঙ্গুর রেকর্ডের (78 RPM) এরপর এসপি (SP), ইপি (EP) ও এলপি (LP) রেকর্ডের প্রচলন হল। এই রেকর্ডগুলি ততটা ভঙ্গুর না হলেও রেকর্ড ক্রেতার পক্ষে যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না। গানের রেকর্ডগুলি সখের ধনের মতো তারা আগলে রাখতেন।

সরস্বতী পুজোর সময় সরস্বতী প্রতিমার পাশে বই, খাতা ও কলমের সঙ্গে গানের রেকর্ডগুলি অর্ঘ্য হিসেবে রাখা হতো। অর্থাৎ পুজোর গানকেও আমরা পুজো করতাম। বাংলা গানের স্বর্ণযুগের পুজোর গান আজও আমাদের স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করে। তাই এখনও পুজোর সময় সঙ্গীত পিপাসু বাঙালিরা সেকালের পুজোর গান নিয়ে গর্ব বোধ করেন এবং সেই সব গান এখনও মনকে দোলা দেয় বলে সেই পুজোর গানগুলি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

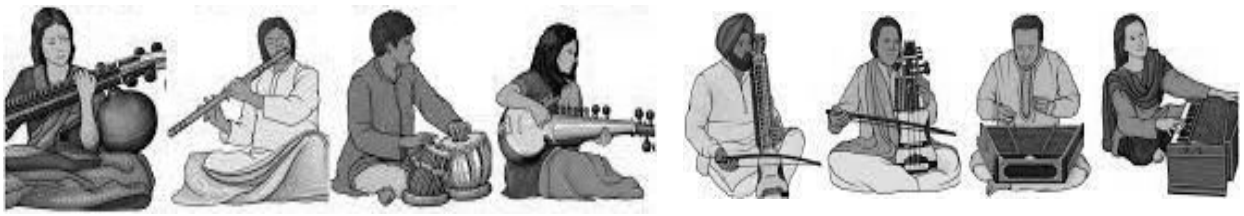

উৎসব ও প্রশাসন

— পঙ্কজ চক্রবর্তী
খোয়াই।

আমাদের ক্ষুদ্র জীবন। এই জীবনকে আরও সুন্দর এবং উপভোগ্য করে তোলার জন্য প্রয়োজন হয় নানা উপকরণের। বিভিন্ন উৎসবগুলো হল তেমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ যা কিনা জীবনকে করে তোলে আরও বেশি আনন্দদায়ক। বহু খরচা করে আয়োজন করা হয় এক একটি উৎসবের। আবার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পৃক্তি যে উৎসবগুলো, বিশেষ করে চিরাচরিত লোক উৎসবগুলোতে প্রানের ছোঁয়া থাকে অনেক বেশি। কিন্তু সেই তুলনায় বাহ্যিক চাকচিক্য, আড়ম্বর আর খরচের বহর ততোটা থাকে না। উৎসবে আমরা একে অন্যের সাথে মিলিত হই। আনন্দ করি। উৎসব আসা মানেই আমাদের মনে কেমন যেন একটা খুশীর অনুভূতি কাজ করে। আসলে একঘেঁয়েমির জীবন থেকে কিছুটা ছেদ নিয়ে মনের খাদ্য যোগাতে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলোকে সতেজ রাখতে জীবনে উৎসবের যথেষ্ট গুরুত্ব ও প্রয়োজন আছে।

কথায় আছে যে বাঙ্গালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উৎসব হল শারদোৎসব। এছাড়াও বছর জুড়েই লেগে থাকে আরও বিভিন্ন উৎসব। আবার আমাদের রাজ্যের জনজাতিদের বিভিন্ন সম্প্রদায়েরও আছে নানা চিরাচরিত উৎসবাদি। সব মিলিয়ে গড়িয়া-গাজন-কের-খারচি-ধামাইল-মনসামঙ্গল-বিজু-বইশু-রমজান ঈদ-বুদ্ধ পূর্ণিমা-রথযাত্রা-বড় দিন ইত্যাদি নানা উৎসবে আমাদের আনন্দ নেওয়ার সুযোগ হয়। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভাব বিনিময়, কুশল বিনিময়ের সুযোগ হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন সুদৃঢ় হয়।

এছাড়াও, উৎসবের বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকের পাশাপাশি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর অর্থনৈতিক দিক। উৎসব মানেই অসংখ্য মানুষজনের অংশগ্রহণ। আর যেখানে মানুষের অংশগ্রহণ থাকবে, সেখানে অবশ্যই থাকবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। যে কোন উৎসবেই মানুষ যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী কেনাকাটা করেন। মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা গড়ে বিক্রি করেন, মণ্ডপশিল্পী, আলোকশিল্পী, ঢাকির দল, কৃষিজীবি, ফুল চাষি, ফল ও সব্জী বিক্রেতা, বাঁশ-বেত বিক্রেতা, মিষ্টির দোকানি, পটারি শিল্পী, জামাকাপড়ের দোকানি, দর্জি, ক্ষৌরকর্মী, মিস্ত্রি-মজুর, ফাস্টফুড বিক্রেতা, অর্কেস্ট্রা শিল্পী, কবি-লোকশিল্পী-বাউল-সুফিগানের শিল্পী-নৃত্যশিল্পী-নাট্যশিল্পী-যাত্রাশিল্পী, পরিবহন শ্রমিক, রিক্সা চালক, ছাপাখানার কর্মী ইত্যাদি সমাজের প্রায় সকল অংশের ও সকল পেশার মানুষজনদের ব্যবসাপাতি, লেনদেনের উৎকৃষ্ট সময় হল এই সকল বিভিন্ন উৎসব। আবার উৎসবে প্রায়শঃই আয়োজকদের পক্ষ থেকে সমাজের আর্থসামাজিকভাবে দুর্বল, অসহায় মানুষের জন্য পোশাক, শীতবস্ত্র, ঢালাও প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে তারাও উৎসবের দিনগুলোতে আনন্দের অংশীদার হতে পারেন। ফলে, সব মিলিয়ে উৎসবের দিনগুলোতে গ্রাম থেকে শুরু করে শহরের প্রায় সব বাজারেই আসে তেজিভাব। মানুষের রুজিরুটি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যপকতা লাভ করে। সেই সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে উৎসব হল মানুষের ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সমাজ জীবনকে সচল ও সতেজ রাখার এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এখন কথা হল, উৎসবে যেমন সমাজের সকল অংশের মানুষের ভূমিকা, অংশগ্রহণ, দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে, তেমনই এতে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কোন ভূমিকা বা দায়দায়িত্ব থাকে কিনা এবং থাকলে সেগুলো কি বা কেমন? এক কথায় উত্তর হল, হ্যাঁ, থাকে। শুধু থাকেই না, প্রকৃতপক্ষে উৎসবের দিনগুলো যাতে সুন্দর হয়, যাতে মানুষের নিরাপত্তা থেকে শুরু করে জল, আলো, ট্রাফিক ব্যবস্থা, চিকিৎসা পরিষেবা, বিপর্যয় কিছু হলে তার সঠিক ও সময়োচিত মোকাবেলা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রায় সকল খুঁটিনাটি বিষয়গুলোকে নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা ও গুরুদায়িত্বটুকু সুষ্ঠভাবে পালন করা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম প্রধান কাজ। একটি বিষয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে প্রশাসন মানে সমাজ বহির্ভূত কোন ভিনগ্রহের উপাদান নয়। বরং প্রশাসন মানে হল সমাজের বিভিন্ন

মানুষের সার্বিক কর্মকান্ড মসৃণ, বিঘ্নহীন, নিরাপদ, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে তোলার একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা। তাই, যে কোন উৎসবে, যেখানেই মানুষের অংশগ্রহণ থাকে, সেখানেই প্রশাসনকে তার উপর ন্যস্ত এইসকল গুরু দায়দায়িত্ব অত্যন্ত সঠিক, সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত ভাবে পালন করতে হয়। প্রশাসনকে এটি নিশ্চিত করতে হয় যে মানুষ যেন সার্বিক অর্থেই উৎসবের প্রকৃত আনন্দ ও নির্যাসটুকু নিতে পারে এবং অবশ্যই যেন একের আনন্দ অন্য কারোর কোন দুঃখ বা ক্ষতির কারণ না হয়। তাই আমরা দেখতে পাই উৎসবের দিনগুলোতে যখন আনন্দের ভাগ নিতে রাজপথে মানুষের ঢল নামে, তখনও সাধারণ প্রশাসন, আরক্ষা প্রশাসন, চিকিৎসা কর্মী, বিদ্যুৎ কর্মী, দমকল কর্মী, বিপর্যয় মোকাবিলার কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকগণ, পানীয় জল সরবরাহের কর্মী থেকে শুরু করে প্রশাসন যন্ত্রের প্রায় সকল জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার সাথে যুক্ত কর্মী ও আধিকারিকগণ তাদের নিজেদের বাড়িঘর, পরিবার-পরিজনদের ফেলে সবার জন্য উৎসবকে আরোও আনন্দ মুখর করতে যে যার কর্মক্ষেত্রে ন্যস্ত দায়দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কখন কোথাও যদি এর ব্যতিক্রম হয়, তাহলে মুহূর্তেই উৎসবের আনন্দ চূড়ান্ত বিষাদে পরিণত হতে পারে যে কোন সময়। এমন সব ঘটনার উদাহরণও কিন্তু একেবারে বিরল নয়।

তাই, সবশেষে এটিই বলার যে উৎসব আমাদের সমাজ জীবনের এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অবিচ্ছেদ্য অংশ আর একে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর রাখার প্রশ্নে প্রশাসনসহ সমাজের সব অংশের মানুষের ভূমিকা ও দায়াবদ্ধতা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসুন, আমরা সকলে মিলে জীবনকে প্রকৃত অর্থেই উৎসব মুখর করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করি।

দুর্গোৎসবে ভুরিভোজ

ডাঃ পার্থ প্রতীক রায়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

উদরপূর্তি না হলে বাঙালির উৎসব উদ্‌যাপন জমে না। শুধু পেট ঠাণ্ডা হলেই তো হবে না, চাই খাবারের স্বাদ-গন্ধে-স্পর্শে মনপ্রাণ ও মগজে উৎসবের আমেজ বুনন করে চলা। শুধু খেয়েই বাঙালির সুখ হয় না, অন্যকে খাইয়ে, খাবার কথা ভেবে, বলে, লিখে আর পড়ে, কত বেশি খেতে পারি বা খাওয়াতে পারি তার প্রতিযোগিতায় নেমে, এমনকি অনুষ্ঠানে খাওয়া নিয়ে কলহ করে — এ সবেই বাঙালির সুখ। তাই রন্ধন, আহার আর সুখানুভূতি সবই 'ভোজন' শব্দের মধ্যে মিলে মিশে গিয়েছে। আবার শুধু ভোজনে পটু হলে মনের ভাণ্ডারে কিছু জমা হয় না, কিন্তু ভোজন রসিক হলেই আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে জমতে থাকে সেই ছেলেবেলা থেকে পেয়ে আসা রসনার স্বাদ।

বাঙালির ঘরে বাইরে সর্বত্রই বারো মাসে তেরো পার্বণ। তাই বিশেষ বিশেষ পার্বণে বিশেষ খাদ্য জায়গা করে নেবে না, তা তো হয় না। ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে দুর্গাপূজা অনন্য। অনন্য এই অর্থে যে, শরতের আবাহনের এই বাংলার প্রকৃতি যেমন দেবীপক্ষের আমন্ত্রণে উদ্বেলিত হয়, বাঙালির হেঁসেলে হাজারো রকম বৈচিত্র্যময় খাদ্যসম্ভারে রাঁধুনী আর ভোজনরসিক উভয়েরই মন ও স্নায়ু সজীব থেকে সজিভ হয়ে ওঠে।

সেই শৈশব-কৈশোরকাল থেকেই তাই দুর্গাপূজা ঘিরে আমাদের ভোজন স্মৃতি গড়ে উঠেছে। আমার মামার বাড়ি উত্তরবঙ্গে-নওগাঁও মহাদেবপুরে, বাবার বাড়ি যশোরের বাঘারপাড়ায়। এই বঙ্গে ভৌগলিক সীমানার সাথে সাথে পাল্টে যেতে থাকে রান্নার উপকরণের মিশ্রণ, প্রকার,

পরিবেশনের প্রকাশ আর স্বাদের প্রকরণ। আমাদের বাড়ির হেঁসেলের ভার প্রথম থেকেই মা'র কাছে থাকাতে স্বাভাবিকভাবেই রান্নার আয়োজনে আর খাবার রান্নায় উত্তরবঙ্গের প্রভাব বেশি। খাওয়ার বেলায় ছোট থেকেই আমাদের বাছ-বিছার কম। শুচিবায়ুগ্রস্ততা আর এঁটোকাঁটার বাড়াবাড়ি আমাদের বাড়িতে কখনোই দেখি নি। বিধবা ঠাকুমার জন্য নিয়মিত আলাদা নিরামিষ রান্না হতো, তাই আমিষ-নিরামিষ সব রান্নাই চলতো — সব খাবারেই আমাদের মুখে রুচি ও উদরে আরাম ঘটতো।

আমরা সপরিবারে 'মিষ্টান্ন' রাশির জাতক। পূজোর খাবারের গল্প শুরু করলে তাই সর্বাগ্রে আসবে মিঠাই-এর কথা। পুজোর বিশেষ বিশেষ খাবারের উপকরণ আসতে শুরু করতো মহালয়া থেকেই। প্রাথমিক প্রধান উপকরণ — ঘি, দুধ আর নারকেল। পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘি বা দুধ মজুত আছে কিনা, কি পরিমাণ নারকেলের প্রয়োজন পড়তে পারে সেটা নিয়ে মা আগেই হিসাব ঠিক করে রাখতেন। শত বছরের ঐতিহ্যবাহী খুলনার বড়বাজার থেকে আসতো নারকেল। কোন নারকেল কত ঝুনা, তাতে কতটুকু শাঁস বা তেল জমে আছে, তা মা দেখলেই বুঝতে পারতেন।

এরপর বুয়াকে দিয়ে চলতো নারকেল কোড়ানো। সন্দেশের ছাঁচগুলো আলমারি থেকে বের করা, ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখা ইত্যাদি প্রস্তুতিপর্বের অগ্রিম কাজ।

দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্র 'ঘোষ ডেয়ারী' নামক মিষ্টির দোকান চোখে পড়বে। শৈশবে আমার ধারণা ছিল এক বিশাল ঘোষ পরিবার কোম্পানী বোধ হয় চেইন সুপার শপের মতো এতগুলো দোকান চালায়। পরে জেনেছি, সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় রাজেন্দ্রপুর গ্রামের ঘোষ পরিবারের হাতে জন্ম বর্তমান পাটকেলঘাটা নামক থানার। এই

পাটকেলঘাটায় পরবর্তীতে 'গোয়ালা' ঘোষদের একটি বেশ বড়সড় সম্প্রদায়-এর পত্তন হয়। এদেরই বংশধরেরা ছড়িয়ে পড়ে পুরো দক্ষিণবঙ্গে, ঘোষ ডেয়ারী নামে মিষ্টান্ন ভাণ্ডার দিয়ে ধরে রাখে তাদের আদি পেশা। আমাদের বাসার থেকে একটু সামনে ঘোষ ডেয়ারীতে প্রতিদিন সকালে বড় বড় ডেকচিতে করে গরুর দুধ আসতে আমি নিজেই দেখেছি, এই দুধ দীর্ঘ সময় ধরে জ্বাল দিয়ে যে ছানা তৈরি হয়, তাকে বলে কাঁচা ছানা। সেই ছানাকে বিভিন্নভাবে পাক এর মাধ্যমে তৈরি হয় রসগোল্লা, ছানার জিলিপি, ছানার সন্দেশ, কাঁচাগোল্লা, সরপুরিয়া — জিভে জল সিঞ্চনকারী সব মিষ্টান্ন।

সেই ঘোষ ডেয়ারী'র পাকঘরে ঢুকে আমি দেখেছি বড় বড় কাপড়ের থলিতে গিঁট বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে কাঁচা ছানা, তা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় দুধ চুঁইয়ে পড়ছে নিচের গামলাতে, ঠিক যেমন আশ্বিনের ভোরে গাছের পাতা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে শিশির। সেই জমাট বাঁধা ছানা কেজি দরে বিক্রি হতো একমাত্র ঐ দোকানটিতে। মা সেই কাঁচা ছানা দিয়ে তৈরি করতেন হরেক রকম পদ।

এদিকে ঘরবাড়ি পরিষ্কার করার তোড়জোড় চলছে, অন্যদিকে কোড়া নারকেল এর সাথে দুধ থেকে বানানো ক্ষীর বিশালকড়াইতে পাক দেয়া হচ্ছে, আর আমি সেখান থেকে নারকেল আর ক্ষীর তুলে খপাখপ মুখে দিচ্ছি, এ বড়ই আনন্দের স্মৃতি। পাকানো মণ্ডটাকে পরে ছাঁচে ফেলে তৈরি হতো নারকেলের সন্দেশ। তেল মাখানো ছাঁচগুলোতে আমি, মা, ঠাকুমা সবাই মণ্ড চেপে দিচ্ছি, আর লতা, পাতা, শঙ্খ, আলপনার ডিজাইন ফুটে উঠছে সন্দেশের শরীরে। এ এক দারুন শিল্প-অভিজ্ঞতা। আরেক ধরণের সন্দেশও বানানো হতো। এতে নারকেল নেই, শুধু ক্ষীর আর চিনির সিরা মিশিয়ে পাকশেষে গরম মণ্ডকে বড় এক পাতে ঢালা হতো, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা হতো অনেকগুলো হীরের মতো চতুর্ভুজ করে। আমরা ডাকতাম বরফি সন্দেশ। বড় বড় রেকাবি, পাত্রে চলে যাবার আগে এর মধ্যে কত সন্দেশ যে লুকিয়ে লুকিয়ে আমার পেটে চালান হতো — তার সংখ্যা বের করা বড় দুঃসাধ্য।

প্রচুর খেজুর আর তাল গাছের প্রাচুর্যের কারণে দক্ষিণবঙ্গ সবসময়ই গুড়ের জন্য প্রসিদ্ধ। আমার বাবার মতো আমিও গুড়-ভক্ত একজন মানুষ। রুটি বা পাউরুটি দিয়ে খাওয়ার জন্য লালী, গুড়, মুড়ি-নারকেল দিয়ে মেখে খাওয়ার জন্য ঝোলা গুড়, আম-দুধ-ভাত বা চিড়া-দই এর মিশিয়ে খাবার জন্য নরম পাটালী গুড়, কিছু না পেলে শুধু চেটে খাওয়ার জন্য শক্ত চকোলেটের মতো ছোট ছোট চৌকা বা গোল আকৃতির পাটালী গুড়। সাতক্ষীরা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা গুড়ের জন্য বিখ্যাত। এর মধ্যে যশোরের 'খাজুরা' বাজারের খেজুর গুড়ের পাটালী হাট এর সুনাম দেশজোড়া। বাবার বাড়ির আত্মীয় স্বজন। কখনো কখনো বাবার কৃতজ্ঞ রোগীরা তাদের ডাক্তারবাবুর জন্য নিয়ে আসতেন খাঁটি পাটালি গুড়। মা ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতেন। পুজোর সময় বের হতো এই মণিমুক্তার ন্যায় গুড়। ঠিক যেমন সিন্দুক থেকে বেরিয়ে আসে হীরে-জহরত। ঘন্টার পর ঘন্টা জ্বাল দিয়ে মা তৈরি করতেন গুড়ের সিরা। সেই গুড়ে নারকেল পাক দিয়ে হাতে হাতে পাকিয়ে তৈরি হত নারকেলের নাড়ু। কি লুচির সাথে, অথবা চা-মুড়ির সাথে, পুজোর বিকেলের আপ্যায়নে এই নাড়ুর উপস্থিতি আবশ্যক। তিল ভেজে একই কায়দায় তৈরি হতে তিলের নাড়ু, আকারে আরো ছোট, বেশ শক্ত এই নাড়ু দাঁত দিয়ে কামড়ে ভেঙে ফেললেই মুখের ভেতর খুলে যেতো স্বাদের এক অন্য জগত। বড় আকৃতির নাড়ুর মধ্যে ছিল এক ধরণের বিশেষ নাড়ু, যা মা খুব যত্ন করে বানাতেন। ক্ষীরের ময়াম ভেজে ছোট ছোট মার্বেলের মতো মণ্ড তৈরি করা হতো, তার চারপাশে গুড়বিহীন চিনির সিরায় পাকানো নারকেলের আবরণ রেখে দেয়া হতো। শুধু নারকেলের নাড়ু ভেবে কামড় বসিয়ে হঠাৎ ক্ষীরের আস্বাদ পাওয়া সেইসব মুহূর্তের কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। বাকি রয়ে যাওয়া গুড় মুড়ি আর চিড়া-র সাথে মাখিয়ে মা তৈরি করে দিতেন মোয়া। ছেলের হাতের মোয়ার মতো তা পুজোর কয়দিন আমাদের হাতে হাতেই থাকত। কখনো বা গরম গুড়ের মধ্যে মা ছিটিয়ে দিতেন বাদাম, ঘন হয়ে জমাট বাঁধলে তা হয়ে যেতো কটকটি। আমার মা পছন্দ করেন রসহীন ঝরঝরে বুঁন্দিয়া। ঘোষ ডেয়ারী থেকে এনে মুড়ি-চানাচুরের সাথে মেখে খাওয়ার কথা এখনো পুরাতন হয়ে যায় নি।

লঘুপাকের সাথে সাথে এবার একটু গুরুপাকের দিকে নজর দেয়া যাক। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে

দুর্গাপুজোর কয়েকদিন খাওয়ার রকমভেদ ভিন্ন ভিন্ন। পুরনো ঢাকা, বিক্রমপুর, চট্টগ্রাম, সিলেটের অনেক জায়গায় রীতিমতো একাদশী পর্যন্ত নিরামিষ খাওয়া হয়। মাছ-মাংসের বালাই নেই। কোন কোন জায়গায় শুধু অষ্টমী বা দশমীর দিন নিরামিষ খাওয়া হয়, কোথাওবা ভোগে মাছের রাজা ইলিশ হয়ে ওঠে প্রধান চরিত্র। এখানে বারোয়ারী পূজার ভোগ আর বাড়ির নিজস্ব পূজার রান্নায় তফাত আছে।

আমার শৈশব কৈশোর, যৌবনের সিংহভাগ কেটেছে শহরে, তাই মন্দিরে পুজোর অঞ্জলি শেষে বাড়ি এসে খাওয়া — এই ছিল নিয়মিত রুটিন। সপ্তমী, নবমীর দিন সকালে লুচিই পরমান্ন। তার সাথে কখনো বিভিন্ন সন্দেশ, কখনো ছোলার ডাল, কখনো বা ছোট ছোট লাল গোল আলুর দম, আবার কখনো টমেটো দিয়ে মটরশুটির পাতলা ঝোল। আমার খুব পছন্দের একটা আইটেম-বাঁধাকপির পায়েস, অক্টোবরে বাঁধাকপি সুলভ। তাই কুচি কুচি করে কাটা কপির সাথে ঘন ক্ষীরের দুধ পাক করে মা যে পায়েস রান্না করতেন, তা দিয়ে সহজেই এক গামলা লুচি খেয়ে নিতে পারতাম। দুপুরে রাতে থাকতো ভাত, চচ্চড়ি, ফুলকপি, আলুভাজা, রুই-কাতলা মাছের মাথা দিয়ে মুড়িঘন্ট, পাতলা মুসুরির ডাল। আমাদের বাড়ীতে মৎস্যভোজী খাদ্যরসিকের প্রাধান্য বেশি। রূপসা নদীর পারসে মাছের ঝোল, সরষে দিয়ে রান্না করা বাটা মাছ, থাই স্টাইলে রান্না করা মাঝারী আকৃতির গলদা চিংড়ি ভাজা, বড় গলদা চিংড়ির মালাইকারী — একের পর এক জিভের সজীবতা আর টেস্ট বাডের সক্ষমতার পরীক্ষা নিতে থাকতো। রূপসার ইলিশের স্বাদ পদ্মার ইলিশের স্বাদ থেকে ভিন্ন। শুধু তেলে ভাজা হোক, বা সরিষা বাটা, কিংবা পাতলা কাঁচাকলার ঝোলের সাথে ডুবো ইলিশ-ইলিশের আহ্বান এড়িয়ে যাওয়া যাবে, এরকম ক্ষমতা নিয়ে অন্তত আমার জন্ম হয়নি। আমার মামাও ইলিশ খেতে খুব পছন্দ করেন। মা একবার আমাকে ও মামাকে একটা পুরো ইলিশ ভেজে দিয়েছিলেন। ভাজা ইলিশের তেল লবণ দিয়ে ভাতের সাথে মেখে আমরা মামা-ভাগ্নে পুরো মাছটাই খেয়ে ফেলেছিলাম। পুজোর কয়দিন খাসির মাংসও চলতো খুব। পাতলা ঝোলের মধ্যে ডুবো ডুবো আলুর সাথে মাংস পোলাও এর সাথে, আর কষানো, একটু পোড়া মাংস বিকালে পরোটার সাথে জুড়ে যেত দারুণভাবে। আমার শাশুড়ীর বাপের বাড়ি বরিশাল, বাটা মশলা নয়, কাটা মশলা দিয়ে ঝোল রেঁধে তাতে ছোট ছোট খাসির টুকরো ছেড়ে দিয়ে তিনি একটি বিশেষ বরিশালীয় পদ রান্না করেন, যা স্বাদে ও গন্ধে অনন্য।

অষ্টমীর দিন সকালে অঞ্জলি দিয়ে মন্দির থেকে ভোগ নিয়ে আসা হয়। একটু মোটা চালের খিচুড়ী, যাতে মেশানো থাকে বাদাম, সাথে বেগুন ভাজী, মিষ্টি কুমড়ার লাবড়া আর পায়েস — ভোগের রান্না জিভে তৃপ্তির সাথে মনে ভক্তিও আনয়ন করে। অষ্টমী-নবমীর দিন বিকেলে বন্ধুদের সাথে ঠাকুর দেখতে বেড়ানো । তখন আবার সম্পূর্ণ অন্য খাবার জগৎ। রাস্তার পাশে ভাজতে থাকা বড় বড় পাপড় নিউজ প্রিন্টের ঠোঙায় মুড়িয়ে চিবোতে চিবোতে রিকশায় করে ঘুরে বেড়ানো আর দেবীদর্শন একসাথেই চলতে থাকতো। এর সাথে থাকতো হরেক রকমের কটকটি, নকুলদানা, বালুসাই, কদমা-বাতাসা, চিনির ছাঁচ। বাড়ি ফিরে পোলাও মাংস দেখলে মনে হতো — আরে, পেট তো একদম খালি। আমার সহধর্মিণী পোলাও-মুরগীর রোষ্ট রান্নায় সিদ্ধহস্ত, কম তেলে রান্না করা ঝরঝরে পোলাও এর সাথে কক মোরগের রোষ্ট খেতে কোনো উৎসব না হলেও আমাদের চলে।

আমার মামারবাড়িতে নবমীর দিন ভোগ রান্না হতো, এখনো হয়। বারোয়ারী পূজার অংশীদার হিসাবে নবমীর দিন মামারবাড়ির রান্না করা ভোগই অন্য সবাই নিয়ে যান, তৃপ্তি করে খান। বাড়ির মেয়ে বৌদের নিয়ে একাজে নেতৃত্ব দেন আমার দিদা। সেখানে পদ হিসাবে থাকে — খিচুড়ি, পাঁচ রকম ভাজা (আলু, পটল, বেগুন, মিষ্টি কুমড়া, বরবটি), পাঁচ মিশালী তরকারীর লাবড়া (ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলু বেগুন, মূলা), রুই-কাতলা মাছ, চাটনী, পায়েস। সে ভোগের স্বাদ আমি জীবনে একবারই পেয়েছি। এখনও আমার জিভ তা স্মরণ করে। আমার শ্বশুড় বাড়ির হেঁসেলে আমিষ ঢুকলেও পেঁয়াজ — রসুন, মুরগী ঢোকা বারণ। অষ্টমীর দিন সেখানে ভাত রান্না হয় না। সেদিন থাকে গরম ফুলকো লুচির সাথে মিষ্টি কুমড়ার ছক্কা (পাঁচ ফোড়ন দিয়ে আলু আর মিষ্টি কুমড়ার তরকারী)। নবমীর দিন পোলাও এর সাথে থাকে হিং দিয়ে রান্না করা খাসির মাংস — একবার খেলে যার স্বাদ আর ভোলা

যায় না।

চাটনী / আচারের কথা না বললে পুজোর ভুড়িভোজের আখ্যান অপূর্ণ থেকে যায়। আমি ভাতের সাথে আলাদা আলাদা সব পদে চাটনী মিশিয়ে খাই। আমার স্ত্রীর ধারণা, আমি সেজন্য কোন কিছুরই আসল স্বাদ পাই না। টক-মিষ্টি চাটনী বেশি পছন্দ, তাই কাঁচা আম আর জলপাই-এর চাটনী সবার থেকে এগিয়ে। চাটনী রান্না না করলেও অসুবিধা নেই, তেলে ডুবানো জলপাই চিনিতে চটকে বা চালতার আচার একটু মেখে নিলেই হলো। জিভেও শান্তি পেটেও শান্তি।

দশমীর দিন বিকেল থেকে আমাদের বাড়িতে অনেক অতিথির নিমন্ত্রণ থাকে এবং সেই দিন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনেকেই সাদরে আমন্ত্রিত হন। সেজন্য মেনু বদলে যায় ফিউশন-এ, একদিকে লুচি, তরকারী, চাটনী, সন্দেশ, নাড়ু। আবার আরেক দিকে কখনো কাচ্চি বিরিয়ানী, রোষ্ট, দই-মিষ্টি, আবার কখনো পোলাও, খাসির মাংস, সরষে ইলিশ, চিংড়ির মালাইকারি — যার যেটা পছন্দ। কালে কালে আয়োজন একটু কমলেও আমাদের আতিথেয়তায় কোনো ঘাটতি কখনো হয়নি।

বিসর্জনের সাথে সাথে আমাদের মন আর্দ্র হয়ে ওঠে, বিদায়ের সুরে মুখে আগের মতো রোচে না সবকিছু। আবার আশায় বুক বাঁধি, পরের বছরের জন্য, আবার উৎসব আসবে, আবার সরগরম হবে হেঁসেল, আবার জেগে উঠবে আমাদের ভোজনরসিক কর্তা-গিন্নীদের অনবদ্য সৃজনশীলতা, আর উদরপূর্তির সাথে সাথে তুষ্ট হবে আমাদের ভোজনবিলাসী মন। আর এই স্মৃতির দরজায় ঘা মেরে মেরে যে 'ভোজন-স্মৃতি' আমি লিপিবদ্ধ করলাম, তার উদ্দেশ্য তো সুকুমার রায় সেই করেই বলে গিয়েছেন —

খাই খাই কর কেন, এস বস আহারে-
খাওয়াব আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে।
যতকিছু খাওয়া লেখে বাঙালির ভাষাতে,
জড় করে আনি সব, থাক সেই আশাতে।

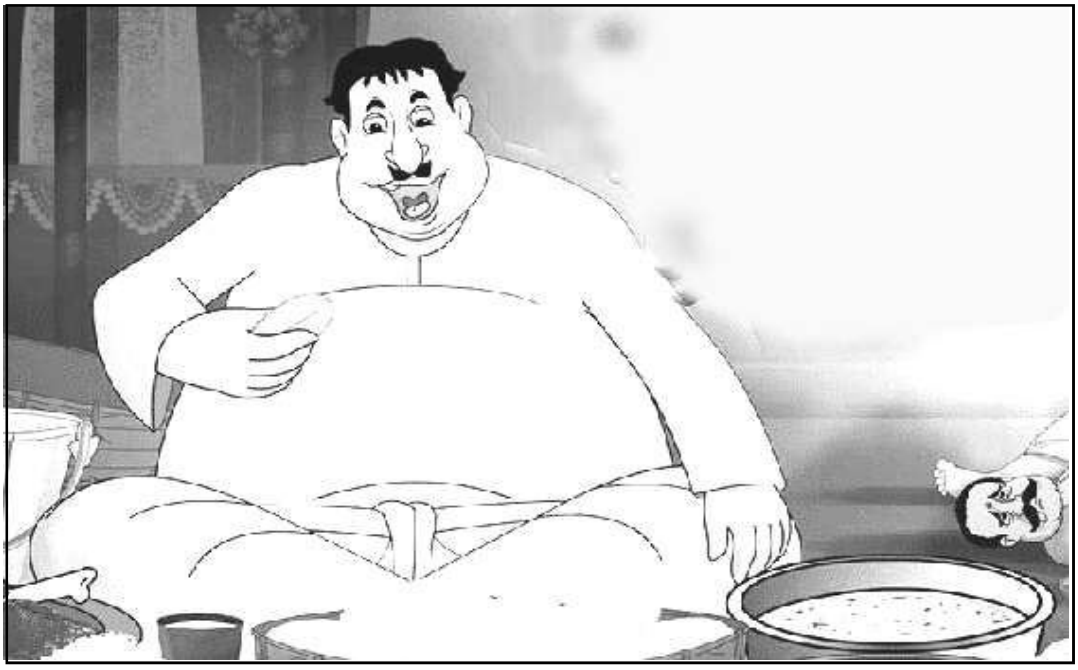

উৎসবের জাঁকজমক ও শিশুর স্বাস্থ্য

— ডা: গোপা চ্যাটার্জি
আগরতলা।

উৎসব শব্দটার গা থেকেই যেন আলো ঠিকরে পড়ে। বাঙালীর বারো মাসের তেরো পার্বণের শুরুই হয় হয়তো ভাদ্র মাসের শেষে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন থেকে। কাগজে কলমে তখন শরৎ। ভোর বেলায় ঘাসের ডগায় হীরের কুচির মত শিশির। রাত গভীর হলে পাতলা দুধের সরের মতো কুয়াশা। এই শিশির আর কুয়াশার দোলাচলে দিনের বেলায় কিন্তু বেশ শক্তিশালী রোদ থাকে। প্রকৃতিপ্রেমিকের জন্য এই সন্ধিকালীন ঋতু খুব আকর্ষক হলেও গরম আর ঠান্ডায় জীবাণুদের পোয়াবারো। আর এই সকল ঋতু শিশু আর বৃদ্ধ উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর।

সাধারণ ভাষায় যাকে আমরা ঠান্ডা লেগে যাওয়া বলি তা হল আসলে ভাইরাল সংক্রমণ। কোভিডের পর আমরা ভাইরাস শব্দটির সাথে বিশেষ পরিচিত হয়েছি। ভাইরাস সাধারণত শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা করলেও শিশুদের ক্ষেত্রে পেটের সমস্যা বা ডায়রিয়াও করে। শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের ফলে সাধারণ সর্দিকাশি থেকে নিউমোনিয়া পর্যন্ত হতে পারে। শিশুর টিকাকরণ যদি অসম্পূর্ণ থাকে অথবা প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে তাদের ক্ষেত্রে সহজেই ফুসফুসের সংক্রমণ হতে পারে। এই ধরণের সংক্রমণ মুখের ওষুধে না সারলে হাসপাতালে ভর্তিও লাগতে পারে।

যে সব বাচ্চাদের এলার্জি বা এস্থমা থাকে তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা বেশি হতে পারে। উৎসব মানেই নিয়মের হেরফের। খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম। বেশি রাত অব্দি জাগা। বাইরের খাওয়া, ফাস্ট ফুড এসবের আধিক্য। মনে রাখতে হবে যে অনিয়মিত জীবনযাত্রা মানেই প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া। সাথে অনিয়ন্ত্রিত খাওয়া দাওয়া থেকে পেটের সংক্রামণের সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে পুজো বা উৎসবের পর পেটখারাপের সম্ভাবনা থেকেই যায়। বাইরে বের হলে পরিচ্ছন্ন পানীয় জল সেবন এবং হাত ধোওয়ার অভ্যাস করতে হবে। পুরনো খাবার বর্জন করাই উচিত। উৎসব মানেই আলোর রোশনাই এবং তার সাথে আতসবাজি। আতসবাজির ধোঁয়া শ্বাসকষ্টের শিশুদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এছাড়াও মাত্রাতিরিক্ত শব্দবাজির আওয়াজ কানের এবং হৃদযন্ত্রের সমস্যা সৃষ্টি করে।

উৎসবের উচ্ছ্বাসে অধিক জনসমাগম এবং ভীড়ও সুস্থতার পরিপন্থী। ব্যস্ততা এবং ক্লান্তির কারণে

দুর্ঘটনার চান্সও বেড়ে যায়। ছোট বাচ্চাদের নিয়ে ভিড়ে যাওয়ার আগে সাবধানতা রাখা উচিত। আনন্দ উৎসব আমাদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। আনন্দ ছাড়া জীবন একঘেয়ে। অসুস্থতার ভয়ে কি শিশুরা আনন্দ করবে না? তবে নির্বিঘ্নে উৎসব যাপনের জন্য আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে। যেমন এক বছরের কম বয়সী শিশুদের নিয়ে বেশি ভিড়ে না যাওয়াই ভালো। শিশুর নিয়মিত টীকাকরণ সম্পূর্ণ করা হোক। দুর্ঘটনা এড়াতে বাবা মায়ের অধিক সচেতন থাকা উচিত। একটু বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কোথাও গেলে পরিচ্ছন্ন জল পান করানো উচিত। নিজস্ব জলের পাত্রে অথবা প্যাক করা জল খাওয়া উচিত। বাইরের খাবার এড়িয়ে চললেই ভালো। তবে খেলে সদ্য প্রস্তুত করা খাবার খাওয়া যায়। শ্বাসকষ্ট জনিত রোগের বাচ্চারা বেশি ভিড়ে পুজো দেখতে গেলে মাস্ক ব্যবহার করলে ভালো। আতসবাজি নিয়ে আনন্দ করার সময় বড়রা সামনে থাকা উচিত। ছোটখাটো দুর্ঘটনা এড়াতে সঠিক পোশাক নির্বাচন জরুরী।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়া সংক্রমণ। বর্ষার পরবর্তী শরত আবহে পতঙ্গবাহিত রোগ খুব বেড়ে যায়। এই ব্যাপারে সচেতন থাকা। মশামাছির থেকে দূরে থাকা। ঘরের চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা। দুদিনের বেশি জ্বর হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অবশ্যই জরুরি। যে সকল শিশু নিয়মিত ইনহেলার নেয় তারা উৎসব মরশুমে যাতে ভালো থাকে সেইজন্য সেটা কন্টিনিয়ু করা উচিত।

উৎসব সবার ভালো কাটুক। উচ্ছ্বাস চাই, কিন্তু সাবধানতা থাক। হুল্লোড় চাই, কিন্তু সীমারেখা থাকুক। আতসের স্নিগ্ধ আলো থাকুক, কিন্তু দূষণ নয়। স্বাস্থ্যই সম্পদ। আগামী প্রজন্ম যাতে সুস্থভাবে আনন্দ করতে পারে তার জন্য চাই সুন্দর ও নির্মল পরিবেশ। উৎসবের রোশনাইয়ে সবার স্বাস্থ্য উজ্জ্বল হোক।

আরক্ষাকর্মীর ভাবনায় দুর্গোৎসব

— প্রনব সেনগুপ্ত
আগরতলা।

বাস্তবিক রক্ত মাংসের জীবনটা শুধুমাত্র নীতিকথা আওড়ানোর জায়গা নয়। পূজোর দিনগুলোতে আইন-শৃঙ্খলাকে সুষ্ঠ ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে যওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। যখন আইন-শৃঙ্খলা ভাল থাকে তখন গণতান্ত্রিক সরকারের উপর জনসাধারণের আস্থা শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। এই কাজটুকুর গুরু দায়িত্ব আরক্ষাকর্মীদের উপর। প্রয়োজন কর্তব্যের অনড় ও দৃঢ়তার, গরমে কাহিল, দুর্যোগ — ছুটি, কিন্তু ওরা ছুটি কোথায় পাবে?

দুর্গোৎসব মানেই সর্বজনীনতার সর্বোত্তম প্রকাশ। বৃহত্তর আযোজন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মঙ্গল ও হিতকামনায়। যা অন্য কোনও উৎসবে দেখা যায় না। জনগণের পার্থিব ও অপার্থিব সুখ নানাভাবে এই সর্বজনীন উৎসব নানাভাবে আহ্বান করে, শ্রদ্ধার সঙ্গে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মাতৃরূপের ভজনা ও পূজা প্রচলিত। বাস্তব জীবনে মা সন্তানের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। তেমনি ঈশ্বরকে মায়ের আসনে মাতৃরূপে বসিয়ে মানুষ আমৃত্যু পরম স্নেহের নিরাপদ মাতৃক্রোড়কে নিশ্চিত করে রাখতে চায়, তাইতো দুর্গোৎসব। শেফালী ফুলের সুবাস, সাদা রঙের কাশফুল শরৎকালের প্রতীক। মেঘের রং বদলাতে শুরু করেছে। ফুরফুরে বাতাসে মায়ের আগামণীর বার্তা, পূজো আসছে ভাব চূড়ান্ত প্রস্তুতি, আপামর জনগণ উৎসবের জন্য উৎসুক। তারই মাঝে আরক্ষাকর্মীদের চোখে মুখে ছাপ আছে সচেতনতার — যা দুর্যোগে, কর্তব্যে সজাগ ও দায়িত্বশীল থাকার শিক্ষা দেয়। পুলিশ গণতন্ত্রের প্রহরী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং অপরাধ নিবারণই পুলিশের প্রধান ধর্ম, তার উপর থাকে চাপ এবং সমাজের প্রত্যাশা। কিন্তু তবুও বলতে হয় ওরাও মানুষ, ওদেরও মা-বাবা, স্ত্রী সন্তান আছে। মানুষের আনন্দ-ব্যস্ততা— আরক্ষা কর্মীদের ছুটি বন্ধ, ওরা হয়ত ভাবে আমি মুক্ত কিন্তু বন্দী খোলা কারাগারে। শরতের ভেসে আসা মেঘে। আকাশে সুগন্ধি, আনন্দ-হুল্লোড়, নব যৌবনে মাতোয়ারা যুবক-যুবতী। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে জীবনের আনন্দ। বৎসরান্তে মরচে পড়া সম্পর্ক নতুন দিনের মুখ দেখে কিন্তু পুলিশ এই দলে পড়ে না, এইসব তাদের কানেও প্রবেশ করে না। উপায় নেই আনন্দ উপভোগের, মাতা, পিতা, ভাই, বোন, স্ত্রী সন্তান-সন্তানদের নিয়ে তাদের মুখের দিকে কেউ উদার মনোভাব নিয়ে তাকাই কি? তারা কোন অন্যগ্রহ থেকে আসেনি। তারাও এই সমাজের, সরকারী কর্তব্য ও নির্দেশ তাকে পালন করতেই হয়। দু-বেলা অন্নের জন্য, সংসার পালনের জন্য, জীবন জীবিকার জন্য, মুখ ফুটে বলার জো নেই, কে করবে সঠিক কাজের মূল্যায়ন, কে শুনবে সমস্যা?

শুধু দুর্গোৎসব কেন, মেলা, নির্বাচন, নানাহ উৎসবের আনন্দের দিনগুলো, অবিশ্রান্ত বর্ষণ, ঘূর্ণিঝড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ পুলিশের অবিরাম ডিউটি ঠিক আছে। তার জন্যই পুলিশ বিভাগ, শান্তি শৃঙ্খলা, নিরাপত্তার জন্যই তো পুলিশ। কিন্তু একটু সহমর্মিতায় তো আর পয়সা খরচ হয় না। বিশ্রামহীন অবিরাম পরিশ্রমের পরও কি সে একটু সহানুভূতি পেতে পারে না। সামজিক জীবন হিসেবে পুলিশের চাকুরীর বাইরেও তো একটা জীবন নিশ্চয় আছে। অদৃশ্য শেকলে

আবদ্ধ জীবন বলে কি বাকশক্তি ও লোপ পাবে, না, তা হতে পারে না। মানুষের লড়াই প্রকৃত অর্থেই জীবন জীবিকা ও অস্তিত্বের লড়াই।

এ রাজ্যের শারদ উৎসবে ও শুনেছি মুর্হুমুর্হু স্বায়ংক্রিয় অস্ত্রের গর্জন। দুশ্চিন্তার ভয়াবহ রাত, আরক্ষাকর্মীদের কাঁধে প্রচন্ড দায়িত্ব, ক্লান্তি টেনে ধরেছে শরীরে তবুও আরক্ষা কর্মীর গভীর ভাবনা দায়িত্ব ও কর্তব্য রক্ষায়। মূল উদ্দেশ্য জন নিরাপত্তা। কখনো দুর্গোৎসব ম্লান করে ঘুমন্ত গ্রাম দুর্বার আগুনে জ্বলে উঠেছে, কোথাও স্বাক্ষী গণচিতা, কোথাও ছুটেছে মারমুখী মানুষ। ভাতৃঘাতী সংঘর্ষ, হাহাকার। আরক্ষাকর্মীরা প্রাণপণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কারণ ওরা দায়বদ্ধ।

কখনো আরক্ষাকর্মীরা গালাগাল শুনছে। কোথাও পাথরের আঘাত লেগেছে দেহে। কোথাও গুলির আঘাতে নিস্প্রাণ হয়েছে আরক্ষাকর্মীর দেহ। তখন হয়ত শোনা গেছে মুখোশ পরা কিছু মানুষের বড় বড় বুলি আর বাতেলা। মনে রাখতে হবে অধিকার ও কর্তব্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হতাশা ও বিক্ষোভ থামাতে পুলিশকে প্রতিনিয়ত চাপের মুখে পড়তে হয়, তাই বলে পুলিশ সর্বরোগের ঔষধ হতে পারে না। সবকিছুর জন্য পুলিশ দায়ীও নয়। তা ভেবে, বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। সর্বসাধারণ্যে অনেকসময় শোনা যায়, পুলিশ কি করবে?

সর্বত্রই যখন দোষারোপ এমনকি পারিবারিক কর্তব্যেও অবহেলা এবং পারিবারিক সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন স্বাভাবতই পুলিশ কর্মীকে পরিবারের লোকজন ও দোষারোপ দেয়। তা প্রকৃত অর্থেই সত্য ধীরে ধীরে অসন্তুষ্টি পুলিশ কর্মীর জীবনে হতাশা নিয়ে আসে, পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। কে ভাববে ওদের কথা? তাছাড়া সমস্ত পুলিশের লোককে খারাপ ভাবা ঠিক হবে না। কারো ব্যক্তি বা সমষ্টিস্বার্থ পূরণ না হলেই পুলিশ খারাপ। এ আবার কি? চাপের কাছে অর্থনৈতিক আদেশের কাছে মাথা নত না করে থাকলেই কি কেহ খারাপ হয়ে যায়। কখনো কখনো দেখা যায় মুখরোচক ভাবে সস্তা জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করে একশ্রেনীর ভেকধারী ব্যক্তিত্ব অকাতরে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না জেনে একতরফা পুলিশের কাজের সমালোচনা করে নিজের বাহবা কুড়ায়। সবাইকে কেউ সন্তুষ্ট করতে পারে না।

মনে হয় অনেক পুলিশের পরিবারে এমনকি অনেক পুলিশের ব্যক্তিজীবনেও বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে, অন্যকে বিচার দেওয়ার প্রচেষ্টা করলেও নিজের জীবনে অনেক সময় ঘটে অবিচার। পুলিশের প্রাত্যহিক জীবন, আমার ধারণা আশা, ভরসা থেকে ভয় ও উত্তেজনা বেশী কাজ করে। পুলিশের বেশী ভাবতে হয় তার পেশাগত জীবনের কথা। আশা ও স্বপ্নের অপমৃত্যু, হতাশার জন্ম। আরক্ষা কর্মযজ্ঞে কখনো অদৃশ্য হাত হিংস্র হয়ে ওঠে। কনকনে শীত হৃৎপিণ্ড ফুলে উঠে তবুও জীবন বাঁচাতে জীবন বাজী। ঘুমন্তপুরীতে রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে চলেছে কর্তব্য। তবুও ওরা দোষী। ক্লান্ত মানুষের যেমন ন্যায়-অন্যায় প্রতিবাদহীন, তেমনি আরক্ষাকর্মীও আইনের কষাঘাতে ভাষাহীন। বিদ্বজনরা বলে থাকেন গণতন্ত্রে যেমন সার্বভৌমত্ব তেমনি ব্যক্তি চায় ব্যক্তিস্বাধীনতা। কিন্তু আরক্ষাকর্মীর মুখে থাকে অদৃশ্য আইনী বলয়। জানি অভীষ্ট বহুদূর, আকাশে তারারা জেগে থাকে নিদ্রাহীন ভাবে, আরক্ষা কর্মী জাগে নিদ্রিত আত্মার পাহাড়াদার হয়ে। তারারা রাতের আকাশে জেগে থাকবে চিরদিন, আরক্ষা কর্মীরাও রাত জাগা কর্তব্য চালিয়ে যাবে যতই ভৎসনা আসুক না কেন, এটাই কালের অমোঘ নিয়ম।

আমরা এই সমাজে ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। উৎসবে যখন আমরা রাতভর আনন্দে সামিল হই রাস্তার পাশে আরক্ষাকর্মীটি কিন্তু সতর্ক থাকে আমার, আমাদের আনন্দের যেন কোন ঘাটতি না হয়। এককথায় ওরা থাকেন কর্তব্যে অনড়। এবং এটাই কামনা করেন এবারের শারদোৎসব সুন্দর হোক, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকুক। এদের এই অনড় মনোভাবই উৎসবকে করে তোলে সর্বাঙ্গীন সুন্দর যা আগামীর পথকে সুদৃঢ় করে।

হাজার বছর পরের তেজগাঁ স্টেশনে। আর আমি আমাজান বনে।
আমার পেছনে ডাইনোসর, মধ্যে দশ হাজার বছর, সামনে পুলিশ।

— ইমতিয়াজ মাহমুদ

পাখী সব করে রব উৎসব আসিল

— পার্থ সারথি চক্রবর্তী
আগরতলা।

স্বপন স্যার যখন ফোন করে বলেছিলেন 'পূজায় পাখিদের সমস্যা' বিষয়ে একটা লেখা দিতে তাঁদের ম্যাগাজিনের জন্য, আমার তো আক্কেলগুড়ুম!! এমনভাবে তো ভাবিনি কোনও দিন। আবার তাঁকে বারণ করবো এমন ধৃষ্টতা দেখানোর কথাও ভাবতে পারি না। ফলত ব্রেণ স্টর্মিং, বই ঝাড়াঝাড়ি, নেট ঘাঁটাঘাঁটি... কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হচ্ছিল না। পূজা মানে তো আনন্দ, হৈচৈ, হুল্লোড়, বড়বড় মণ্ডপ, আলো, ভিড়, নতুন জামা ইত্যাদি। তাতে খামোখা পাখিদের সমস্যা হতে যাবে কেন? ঠিক তখনই মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় সাধুভাষায় পড়া একটা নীতি-গল্পের কথা। গল্পের মূল কাহিনী এইরকম — একটি ছেলে একটা পুকুরে অনেকগুলো ব্যাং দেখে তাদেরকে ঢিল ছুঁড়ছিল। ব্যাঙদের সর্দার সেটা দেখে ঐ ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, তুমি আমাদেরকে ঢিল ছুঁড়ে মারছ কেন? বালক উত্তর দিয়েছিল, আমি তো আমোদ করছি মাত্র। তখন সেই ব্যাঙ ছেলেটিকে বলেছিল, "তোমার আনন্দ যেন আমাদের মৃত্যুর কারণ না হয়"।

এই গল্পের কথা মাথায় আসাতে আমিও ভাবতে বসলাম, আমাদের এই আনন্দ পাখিদের ক্ষতি বা মৃত্যুর কারণ হতে পারে কি? প্রথমেই বলে রাখি, আমি কিছু সম্ভাবনার কথাই বলতে পারব শুধু। সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষমতা এই অধম ছবিওয়ালার নেই। তবে আমি আশাবাদী, সঠিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে একদিন নিশ্চয়ই সবকিছু সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা সম্ভব হবে। আজকের আলোচনায় আমি কিছু ভাবনাকে আর আপনাদের শুভবুদ্ধিকে উস্কে দিতে চাইছি মাত্র। যাতে করে আমাদের আনন্দ অন্য কারও মৃত্যুর কারণ না হয়।

আমাদের উৎসবের প্রধান তিনটে ভাগ আছে — ১) প্রস্তুতি পর্ব, ২) উৎসবের সময়কালীন পর্ব ও ৩) প্রতিমা নিরঞ্জন পর্ব। একে একে বরং দেখা যাক এই পর্বগুলোতে পাখিদের উপর কি কি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রস্তুতি পর্ব

প্রস্তুতি পর্বে বাঁশের ঝাড় উজাড় করে বানানো হয় গগনচুম্বী পূজা মণ্ডপ। এমনিতেই কড়ুল-প্রিয় (বাঁশের অঙ্কুর) ত্রিপুরাবাসী প্রচুর কড়ুল কেটে খেয়ে ফেলেন গোদক বানিয়ে। তদুপরি উৎসব মরসুমে বাঁশ সংগ্রহ করতে গিয়েও একদমই পরিকল্পনাহীন ভাবে প্রচুর বাঁশ কাটা হয়। যথেচ্ছ বাঁশ কাটার ফলে পাখিদের উপর নানা রকম বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন —

বাসস্থানের ক্ষতি ঃ বাঁশঝাড় অনেক পাখিদের প্রধান আবাসস্থল। যেমন নানা রকম শুমচা, সাদা ভ্রূ কাঠঠোকরা, সাদা-গলা লেজনাচানি ইত্যাদি। বাঁশের ঝাড়গুলো নির্বিচারে কেটে ফেলার কারণে ঐ পাখিদের উপযুক্ত আবাসস্থল বিনষ্ট হয়।

খাদ্যের উৎসের ক্ষতি ঃ বাঁশের বন অনেক পাখিদের জন্য খাদ্যের প্রধান উৎস। বাঁশের বীজ, পোকামাকড় এবং অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণী খায় অনেক পাখিই। বাঁশঝাড় যথেচ্ছ পরিমাণে কমে গেলে ঐ পাখিদের খাদ্যের যোগানে অবশ্যই টান পড়বে।

প্রজনন চক্রের ব্যাঘাত ঃ অনেক প্রজাতির পাখি তাদের প্রজনন ঋতুতে বাসা বাঁধার জন্য বাঁশঝাড়ের উপরেই নির্ভরশীল। এই সময়ে বাঁশ কাটা তাদের প্রজনন চক্রকে ব্যাহত করতে পারে।

পাখিদের রক্ষা করতে, বাঁশ ও কড়ুল কাটার ব্যাপারে অত্যন্ত দায়িত্বশীল হতে হবে। পাখিদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে বেশ কিছু ঝাড় জায়গা অক্ষত রেখে বাঁশ সংগ্রহ করা যেতে পারে। পাখিদের প্রজনন মরশুমে বাঁশ কাটা থেকে বিরত থাকতে হবে যাতে তাদের বাসা বাঁধতে এবং প্রজননে বাধা না হয়। যেসব এলাকায় পূর্বে প্রচুর বাঁশ কাটা হয়েছে সেখানে নতুন করে বাঁশের ঝাড় তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে। আর আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় রড পাইপ ইত্যাদি ব্যবহার করে মণ্ডপ তৈরিতে বাঁশের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ফেলা উচিৎ।

উৎসব চলাকালীন পর্ব

আমাদের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা থেকে কালীপূজা পর্যন্ত

সময়কালে প্রচুর কৃত্রিম আলো যেমন জ্বালানো হয় তেমনি সাউণ্ডবক্স, ঢাক ঢোল, ব্যাণ্ডপার্টি, শব্দবাজি ইত্যাদির উচ্চগ্রামের শব্দ সবাইকে জব্দ করে দিন-রাত্রি। এগুলো থেকেও পাখিদের নানারকম সমস্যা হতে পারে। যেমন —

ঘুমের ব্যাঘাত ঃ উৎসবের দিনগুলোতে, বিশেষ করে শহুরে এলাকায়, আলো দূষণ পাখিদের স্বাভাবিক ঘুম-চক্রের ব্যাঘাত ঘটায়। বেশীরভাগ পাখি তো দিবাচর অর্থাৎ তারা দিনে সক্রিয় থাকে এবং রাতে ঘুমায়। উৎসবের দিনগুলোতে অত্যধিক পরিমাণে কৃত্রিম আলো তাদের বিভ্রান্ত করতে পারে, যার ফলে তারা রাতেও জেগে থাকে। ওদিকে উচ্চগ্রামের আওয়াজগুলোও পাখিদের 'জিনা হারাম' করে দেয়, একেবারে গোঁদের উপর বিষফোঁড়া যাকে বলে। এইভাবে সপ্তাহখানেক রাতে ও দিনে জেগে থাকার ফলে পাখিদের স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে।

পরিবর্তিত মাইগ্রেশন প্যাটার্ন ঃ পাখিরা পরিযান অর্থাৎ মাইগ্রেশনের সময় দিকনির্ণয়ের জন্য নক্ষত্র এবং চাঁদের আলোর মতো প্রাকৃতিক সংকেতের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যখন তারা উজ্জ্বল কৃত্রিম আলোর মুখোমুখি হয়, তখন দিকভ্রান্ত হয়ে তাদের স্বাভাবিক গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়। এ ব্যাপারে কিন্তু অনেক গবেষণা হয়েছে। এই জন্যেই পরিযোজন কালে বাইরের আলো কমিয়ে ফেলার আবেদন করা হয় অনেক সংস্থার পক্ষ থেকে। আর শরৎকাল থেকেই তো পাখিদের পরিযোজন শুরু হয়ে যায়, তাই আমাদের উৎসবের দিনে অত্যধিক কৃত্রিম আলো যে পাখিদের পরিযানে ব্যাঘাত ঘটায় এ কথা কিন্তু হলফ করেই বলা যায়।

চারণ এবং শিকারের সমস্যা ঃ রাতে উজ্জ্বল কৃত্রিম আলো নানা রকমের পেঁচা, ল্যাঞ্জা রাতচরা ইত্যাদি নিশাচর পাখিদের শিকারের ক্ষমতাকে হ্রাস করতে পারে এবং এটি অন্যান্য প্রজাতির পাখিদের খাদ্য গ্রহণের স্বাভাবিক সূচিকেও বিরূপভাবে প্রভাবিত করতে পারে। ফলশ্রুতিতে সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রেরই ক্ষতি হবার সমূহ সম্ভাবনা।

যোগাযোগের সমস্যা ঃ পাখিরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে কণ্ঠস্বর এবং অন্যান্য শব্দ ব্যবহার করে। উৎসবকালীন পরিবেশে অত্যধিক কৃত্রিম শব্দও কিন্তু পাখিদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করতে পারে।

স্ট্রেস এবং স্বাস্থ্য সমস্যা ঃ কৃত্রিম আলো এবং শব্দের দীর্ঘায়িত এক্সপোজার পাখিদের মধ্যে মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ (এংজাইটি) সৃষ্টি করতে পারে। যেটা তাদের ইমিউন সিস্টেমকে দুর্বল করবে ফলে সহজেই তাদের নানারকমের রোগজীবাণু আক্রমণ করতে পারবে।

বাজি পোড়ানো ঃ দুর্গাপূজার বিসর্জন ও দীপাবলিতে এত পরিমাণে বাজি পোড়ানোর ফলে যে ভয়ানক শব্দ ও বায়ু দূষণ হয় সেগুলো যেহেতু মানুষের প্রভূত ক্ষতি করে তাই সেগুলো নিশ্চিতভাবেই পাখিদেরও বিশাল ক্ষতি করে।

মোবাইল বিকিরণ ঃ মোবাইল বিকিরণ পাখিদের উপর কিছু বিরূপ প্রভাব ফেলে কি না সেটা এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও এই বিকিরণ এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের অন্যান্য কারণের ফলে সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে। নিশ্চিতভাবে এটাও বলা যাচ্ছে না যে কোনও ক্ষতি করে না। কিন্তু পূজার ভিড়ে দাঁড়িয়ে শত শত হাত যখন মোবাইল ক্যামেরায় ছবি তুলবে বা লাইভ ভিডিও বানাবে কেউ কি একবারও ভাববে একসাথে এত এত মোবাইলের বিকিরণ পাখিদের অকাল মৃত্যুরও কারণ হতে পারে?

পাখিদের উপর অত্যধিক কৃত্রিম আলো এবং শব্দের প্রভাব কমানোর জন্য, বিশেষত পরিযায়ী ঋতুতে বাইরের অপ্রয়োজনীয় আলো বন্ধ করা, পাখি-বান্ধব আলোর ফিক্সচার ডিজাইন করা এবং গুরুত্বপূর্ণ পাখির আবাসস্থলগুলিতে শান্ত অঞ্চল তৈরি করার মতো ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা অপরিহার্য। মূল কথাটি হল, আলো ও শব্দ দূষণ হ্রাস করে পাখি সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

বিসর্জন পর্ব

প্রতিমা নিরঞ্জনের কারণে যে ভয়ানক জল দূষণ হয় একথা আজ সবারই জানা। জল দূষণের ফলে পাখিদের উপর যে সব ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে, সেগুলো হল —

পানীয় জলের অভাব ঃ সমস্ত প্রাণীদের মত, পাখিদেরও পানীয় এবং স্নানের জন্য পরিষ্কার জলের প্রয়োজন হয়। জল দূষণের কারণে পানীয় জলের অভাব পাখিদের দেহে জলাভাব ঘটিয়ে তাদের নানা রকম ক্ষতি এমন কি মৃত্যুরও

কারণ হতে পারে।

খাদ্যের অভাব ঃ জল দূষণ মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীদের মেরে ফেলে। ফলস্বরূপ, যে পাখিরা খাদ্যের জন্য এগুলোর উপর নির্ভরশীল তাদের খাদ্যের যোগান কমে যেতে পারে।

দূষিত খাদ্য ঃ জলচর পাখিগুলো খাবার সময় জলে উপস্থিত দূষিত বস্তু গ্রহণ করতে পারে। যেমন, বিষাক্ত রাসায়নিক (রঙ ও অন্যান্য রাসায়নিক যা প্রতিমা তৈরিতে ব্যবহার করা হয়), ভারী ধাতু এবং তৈলাক্ত পদার্থ। দূষিত খাবার বা জল খেয়ে পাখিদের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যা থেকে শুরু করে বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতি এমনকি মৃত্যু হতে পারে।

জল দূষণ যাতে পাখিদের কোনও রকম ক্ষতি না করতে পারে সে জন্য প্রতিমা তৈরিতে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবহার সুনিশ্চিত যেমন করা উচিত তেমনি প্রতিমা বিসর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট ও আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমগ্র জলাভূমিকেও দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য।

শেষ করার আগে আবার শুরুতে বলা গল্পটিতেই ফিরে আসি, আমাদের প্রত্যেকের খেয়াল রাখা দরকার আমাদের আনন্দ যেন পাখিদের মৃত্যুর কারণ না হয়। পাখিদেরকে রক্ষা করার মাধ্যমে সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করলে আখেরে কিন্তু মানুষেরই লাভ হবে। জানেন তো গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মাও সে তুং-এর নির্দেশে চিনের সমস্ত চড়াই পাখিদেরকে মেরে ফেলার কারণে তিন বছরের মধ্যে প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষ মারা পড়েছিল দুর্ভিক্ষে। আমরা নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে এমনটা চাইব না।

একাত্তর সালের দুর্গা পূজা: দেবী দুর্গার ত্রিশুলে ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি

স্বপন ভট্টাচার্য
উদয়পুর।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙ্গালী জাতি গোষ্ঠীর কাছে দুর্গোৎসব আনন্দের বার্তা বয়ে আনতে পারেনি। বরং বলা চলে সর্বত্রই দুঃখ কষ্টের ছাপ ছিল স্পষ্ট। শুধু পাক অধিকৃত পূর্ব বাংলার বাঙ্গালী নয়, ত্রিপুরা, পশ্চিম বাংলা ও বরাক উপত্যকার বাঙালীদের কাছেও একাত্তরের দুর্গোৎসব ছিল দুঃখজনক ও দুর্যোগের। একাত্তরের পঁচিশে মার্চ রাত বারটায় পাকিস্থানী সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্থানের (বর্তমান বাংলাদেশ) নিরস্ত্র মানুষের উপর অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিজের দেশের নাগরিকদের উপর সেনাবাহিনীর এই ধরনের বর্বরোচিত আক্রমনের ঘটনা বিরল। ২৫শে মার্চ থেকে শুরু করে নয় মাস ব্যাপী পাক বাহিনী ও তাদের দোসররা ত্রিশ লক্ষ বাঙ্গালীকে হত্যা করেছে, দুই লক্ষাধিক মা-বোনদের ইজ্জত লুন্ঠন করেছে। এক কোটি বাঙ্গালী ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল সেই সময়। ভারতের ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয় ও পশ্চিম বাংলায় আশ্রয় নেন পূর্ব বাংলার মানুষ। ভারত সরকার শরনার্থীদের জন্য অস্থায়ী শিবির তৈরী করে তাদের থাকার ব্যবস্থা করেন এবং বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ করেন। এমন এক শোকের আবহে প্রকৃতির নিয়মেই শরৎ আসে। আসে দুর্গোৎসব। মা দুর্গাকে আমরা ঘরের মেয়ে বলে ভাবি। সেই মেয়ের বাপের বাড়ীতে আগমন আনন্দদায়ক হলো না। সেবার মা এসেছিলেন দুঃসময়ে ও দুযুর্গের মধ্যে। ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী শরনার্থীদের একটি বড় অংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। দুর্গা পূজার সময় তাঁরা আরও বিষন্ন হয়ে পড়লেন। নিজের দেশ ছেড়ে অন্যদেশে আশ্রয় শিবিরে পড়ে রয়েছেন দুর্গোৎসবের দিনগুলিতে, এটা যে কতখানি কষ্টের, তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। এদের দুঃখের শরিক হলেন আমাদের দেশের মানুষ জনেরাও। সেই সময়ের উদয়পুরে দুর্গাপূজার সংখ্যা ছিল নগন্য। শহর এলাকায় সর্ব সাফুল্যে আট-দশটি পূজা হতো। পুজোর জৌলুশ ছিলনা। বাহান্ন বছর আগের উদয়পুরে তখন হ্যাজাক লাইটের যুগ পার হয়ে বৈদ্যুতিক আলোয় মাত্র প্রবেশ করেছে। আগরতলা শহর ছাড়া মহকুমা শহরগুলিতে তখন বৈদ্যুতিক আলোর চমক ছিলনা। একাত্তরে দুর্গোৎসবের উদ্যোক্তারা নিজেরাই নিয়ম রক্ষার পূজা করেছিলেন ওপার বাংলার মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা ভেবে। কোন কোন পূজা কমিটি টাকা বাঁচিয়ে সেই অর্থ দান করেছেন ‘‘বাংলা দেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতির তহবিলে। বিভিন্ন যুব সংগঠনের কর্মীরাও চাঁদা তুলে শরনার্থী শিবিরের বাসিন্দা শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের নতুন জামা-কাপড় কিনে দিয়েছেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও কেউ কেউ ছিন্ন মূল শরনার্থীদের পুজোর সময় সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। প্রশাসন থেকেও আইন বাঁচিয়ে রেশনের পরিমান বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়েছিল। কোন কোন শিবিরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় শরনার্থীরা মিলিত ভাবে চাঁদা তুলে দুর্গা পূজার আয়োজন করেছিলেন। শরনার্থী শিবিরে শিবিরবাসীদের উদ্যোগে দুর্গা পূজার আয়োজন করেছিলেন। শরনার্থী শিবিরে শিবিরবাসীদের উদ্যোগে দুর্গা পূজার আয়োজন হয়েছিল পশ্চিম বাংলা, আসামের শিলচর ও ত্রিপুরার বিভিন্ন শিবিরে। সেই সময়ের আনন্দবাজার পত্রিকায় পশ্চিম বাংলা, আসামের শিলচর, ত্রিপুরার আগরতলা, উদয়পুর সহ বিভিন্ন জায়গায় শরনার্থীদের সঙ্গে নিয়ে পুজোর আনন্দে মেতে ছিলেন। তাদের মানসিক কষ্ট দূর করতে স্থানীয় মানুষ পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, নিয়েছিলেন নিকট আত্মীয়ের ভূমিকা। এখানকার মানুষ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে কতটা একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন, তার প্রমান মেলে দুর্গা মন্ডপের দৃশ্যেও। উদয়পুরের পালাটানাতে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বড় ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল (বর্তমান গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র)। বাংলাদেশ সরকারের সর্ব্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান ‘একুশে পদক প্রাপ্ত মুক্তি যোদ্ধা ও বিশিষ্ট সাংবাদিক অজয় দাশগুপ্ত পালাটানায় ট্রেনিং করেছিলেন। তাঁর কাছে শুনেছি, জামজুড়ি, পালাটানা অঞ্চলের দুর্গা পূজা দেখার জন্য তাঁদের একদিন ছুটি দেওয়া হয়েছিল। দল বেঁধে তাঁরা দুর্গা মন্ডপ ও প্রতিমা দর্শন করতে বের হন। সব কয়টি মন্ডপেই তাঁরা এক অভূতপূর্ব জিনিস দেখতে পান, তা হল প্রতিটি মন্ডপে দুর্গা প্রতিমার হাতের

ত্রিশূলে বাংলাদেশের জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানে র ছবি লাগনো রয়েছে। এই দৃশ্য দেখে তাঁরা অবাক হয়ে যান। অজয়বাবু একটি মন্ডপের উদ্যোক্তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করেন, দুর্গা দেবীর ত্রিশূলে আপনারা যার ছবি লাগিয়েছেন, তিনি তো মুসলমান। আপনার হিন্দুর দেবীর ত্রিশূলে মুসলমানের ছবি দিলেন কেন? অজয় বাবু তাঁর প্রশ্নের উত্তর শুনে বিস্মিত ও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। উদ্যোক্তারা তাঁকে জানান এখন আসল অসুর হল পাকিস্থান। এই অসুরকে বধ করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান। কাজেই পাকিস্থান নামক অসুর বধের ডাক দিয়েছেন যিনি, তিনি হিন্দু না মুসলমান সেটা বিবেচনার সময় এখন নয়। পাকিস্থান নামক অসুর বধ করতে যিনি লড়াই শুরু করেছেন, তিনি আমাদের কাছে পুজনীয় ব্যক্তি। এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে এখানকার মানুষ কতটা একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। পরে জেনেছি শুধু উদয়পুর নয়, অন্য অনেক জাগায় এমন ঘটনা ঘটেছে। পাকিস্থানের সেনাবাহিনীর নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে তখন পূর্ব বাংলার প্রায় সব হিন্দুই ভারতে এসে আশ্রয় নেন। পাকিস্থানের সামরিক শাসকরা তখন বিশ্বকে বুঝাতে চেষ্টা করছে পূর্ব পাকিস্থানের অবস্থা স্বাভাবিক। ভারত মাঝে মধ্যে দুস্কৃতী পাঠিয়ে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এই প্রচারের মধ্যেই দুর্গা পূজা এসে গেল। পূর্ব পাকিস্থানে দুর্গাপূজা না হলে সমগ্র বিশ্বের কাছে প্রমান হয়ে যাবে পূর্ব পাকিস্থানের পরিস্থিতি ভাল নয়। পূর্ব পাকিস্থানের তদানীন্তন গভর্নর মিঃ মালেক এবং তাঁর দোসররা দুর্গা পূজা করানোর নির্দেশ দিলেন প্রশাসকদের। সব জেলা থেকে খবর এল, তাঁদের জেলায় হিন্দু নেই। সব ভারতে চলে গেছে। মুসলমানদের দিয়েতো আর যাই করানো হোক দুর্গা পূজা করানো যাবে না। নিরুপায় হয়ে জেলখানায় আটক হিন্দুদের খুঁজে বের করে আনা হল এবং বন্দুকের মুখে তাঁদের বাধ্য করা হল দুর্গা পূজার ব্যবস্থা করতে। এই নকল পূজার নাটকও জমল না। শুধুমাত্র ঢাকা শহরে দুই একটি তথাকথিত পূজা দেখিয়ে পূর্ব পাকিস্থানের (বাংলাদেশ) বেহাল অবস্থা চাপা দেওয়া গেল না। বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমে প্রচার হয়ে গেল, হিন্দু না থাকায় পূর্বপাকিস্থানে দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয় নি।

বাঙালী হিন্দুদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের আবহে ভারতের হিন্দু বাঙ্গালীরাও আনন্দ সহকারে দুর্গাপূজা করতে পারেননি প্রতিবেশী দেশের মানুষের শোচনীয় দুর্ভোগের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। এই কঠিন সময়েও শরনার্থীরা দুর্গা পূজা করেছেন দুর্গতি নাশের আশায়। কোন কোন শরনার্থী শিবিরে দুর্গা পূজার চারদিন ভারতের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেছেন শরনার্থীরা। তখনকার পরিস্থিতিতে এমন ঘটনা সংগঠিত হওয়ার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা ছিলনা। বাংলাদেশ স্বাধীন হল একাত্তরের ষোল ডিসেম্বর পাকিস্থানী সেনাবাহিনীর আত্ম সমর্পনের মধ্য দিয়ে। ভারত ও বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্ম সমর্পনের পর ভারতের বিরোধী রাজনৈনিক দলের কোন কোন নেতাও ইন্দিরা গান্ধীকে দেবী দুর্গার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। একাত্তরের যুদ্ধের সময় ভারতের সব রাজনৈতিক দল ও মানুষের মধ্যে যে মেলবন্ধন ঘটেছিল, তা একটি প্রশংসনীয় ঐতিহাসিক ঘটনা।

মা দুর্গা, শিড়দাঁড়াটা শক্ত করে দাও

ডাঃ প্রদীপ ভৌমিক

গত দুই ও তিন সেপ্টেম্বর, ঢাকায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর লিভার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যার পোশাকি নাম 9th Annual Conference of South Asian Association of Study of Liver (SAASL) দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং অর্থবহ ছিল। ২রা সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। দুপুর ১২টায় আমার কথা বলার সময় আসে। আমার বক্তব্যের বিষয় ছিল দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে হেপাটাইটিস বি এর বর্তমান অবস্থা এবং হেপাটাইটিস মুক্ত (Eliminate) করার পদ্ধতি। এখানে বলা ভালো Eradication এবং Elimination শব্দের অর্থ এক নয়। Eradication মানে সম্পূর্ণভাবে নির্মূলীকরণ যেমন আমরা Small Pox Eradicate করতে পেরেছি অথবা Polio Eradication -এর পথে। কিন্তু হেপাটাইটিস বিশেষ করে Chronic Hepatitis - B & C হেপাটাইটিস বি এবং সি সম্পূর্ণ Eradicate করাতে অনেক অনেক বছর সময় লাগবে। কেননা যদি একজন রোগীর মধ্যেও হেপাটাইটিস বি এবং সি জীবাণু থাকে তাহলে Eradicate করা কঠিন। তাই ২০১৬ সালে World Health Organisation (WHO) যখন সর্বকালীন সময়ের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল 'Eliminate Hepatitis By 2030'. এজন্য ২০১৫সালকে ভিত্তি বছর ধরা হয়। এবং বলা হয় ২০১৬থেকে ২০৩০ এর মধ্যে ৯০ শতাংশ হেপাটাইটিস সংক্রমন এবং ৬৫ শতাংশ মৃত্যুহার কমানো। (Hepatitis Eliminate Reduce new Hepatitis Infection by 90% and deaths by 65% between 2016 to 2030)। যাই হোক কথা হচ্ছিল বিভিন্ন পন্থা, সিদ্ধান্ত (Strategy) নিয়ে। কী করে ২০৩০ এ Hepatitis Eliminate করা যায়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যে বিষয় দক্ষিণ এশিয়ায় দেশগুলির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো ঃ

এ অঞ্চলে "INTRAVENOUS DRUG USER" (IDU / PWID) এর সংখ্যা বৃদ্ধি, বর্তমানে অন্যতম যে সমস্যা হয়ে উঠে আসছে। যে কারণে Eepatitis B & C এর সংক্রমন এ অঞ্চলে বাড়ছে এবং একে রোধ করাও কঠিন। দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চলে রয়েছে মর্ত্যের ড্রাগের প্রধান ভূমি GOLDEN CRESCENT (আফগানিস্তানসহ অন্যান্য দেশ) এবং পূর্বে রয়েছে GOLDEN TRIANGLE (মায়ানমার এবং অন্যান্য দেশ)। সেই জন্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো ড্রাগ ব্যবহারে স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হচ্ছে। তাই এ অঞ্চল থেকে হেপাটাইটিস বি, সি এবং এইচ আইভি / এইডস্ মুক্ত করা অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। অন্যান্য সব বিষয়ে কথা বলা আরম্ভ হলো প্রশ্নোত্তর পর্ব। একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল একসঙ্গে অনেক দেশের সদস্যরা ড্রাগের সমস্যা নিরাময়ে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। সকলের বক্তব্য ড্রাগ নামীয় এ ভয়ংকর স্বাস্থ্য সমস্যাকে কোন উৎপত্তিতে বিনাশ করা হচ্ছে না বা যাবে না। সবাই সমস্বরে বলতে শুরু করলেন সমস্ত দেশগুলোকে একযোগে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে করবে কে? চিকিৎসক সমাজ বা আমাদের সংস্থা (SAASL) এ কাজ কতটা করতে পারবে। দেশগুলোর রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা কতটা সচেষ্ট হবে? আরো অনেক প্রশ্ন। ড্রাগও আন্তর্জাতিক অস্ত্র বাজারের মতোই ভয়ংকর। এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মতো সাহস আমাদের কারোরই নেই। আমরা যে বড়ই দুর্বল। আমাদের শিঁড়দাঁড়া যে আজও শক্ত হয়নি। 'ড্রাগ' ব্যবসায়ীদের সামনে আমরা নিতান্তই ক্ষুদ্র। নিজেদের অবস্থান বুঝতে পেরে আমরা আবার পশ্চাৎঅপসারণ করলাম। বলেত আরম্ভ করলাম।

১। জনসাধারণের মধ্যে সার্বিক ভাবে ড্রাগের কুফল বুঝিয়ে ড্রাগের ব্যাপারটাকে কম করে দিতে হবে। (DEMAND REDUCTION).

২। যারা ড্রাগ ব্যবহার থেকে সরে আসতে পারছে না তারা যাতে অন্যদের সংক্রমন বাড়াতে না পারে তার জন্য সচেষ্ট হওয়া (HARM REDUTION)।

তবুও আমাদের আলোচনা সবচেয়ে সফলতম দিকটি হলো DRUG বিষয়টাকে আলোচনার কেন্দ্র

বিন্দুতে এনে এর বিরুদ্ধে 'জন আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমরা অত্যন্ত শক্ত কদমে এগিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছি। ঢাকা থেকে আগরতলা ফেরার পথে ভাবছিলাম কদিন পরেইতো মা আসছেন। তার কাছেই সব তুলে ধরবো। বলবো দুর্দান্ত প্রতাপশালী মহিষাসুরকে দমন করতে পেরেছো। তাহলে মা তুমি কেন এই ড্রাগসুরকে বধ করতে পারবে না? মাগো তুমিতো সর্বত্রাতা। আমাদের শেষ আশ্রয়স্থল। নতুন প্রজন্মটা যে ড্রাগের নেশায় বুঁদ হয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! অল্প বয়সে হেপাটাইটিস বি, সি এবং এইডস আক্রান্ত হয়ে এরা তো নিজেদের ধ্বংসের রাস্তা প্রশস্ত করছে। এদের এই বিধ্বংসী মানসিকতার ইতি হোক। মাগো শক্তিদায়িনী, প্রাণে-মনে দাও দুর্দমনীয় শক্তি। এবার আরম্ভ হোক 'ড্রাগাসুর' বধ যজ্ঞ। 'উন্মেষ' হোক আমাদের প্রবল ইচ্ছাশক্তি। আগামীকে স্পর্শ করুক নতুন সৃষ্টিপ্রবাহ। শুধু শিড়দাঁড়াটাকে শক্ত করে দাও মা!

"যা দেবী সর্ব ভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"।

শারদোৎসব যেন আলোর উৎসব

— দীপক লোধ
উদয়পুর।

শরৎ মানে দিগন্ত দিশারি নীলাকাশ। যার নিচে চলতে থাকে উৎসব পাগল মানুষের নির্ভয় বিচরণ। বৃহত্তর অংশের বাঙালীর কাছে শরতের মহাকর্ষণই হল পরম্পরার পরম সোহাগের মেগা পার্বন তথা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার শারদোৎসব'। পোশাকী পরিচয়ে দুর্গোৎসব। স্ফটিক স্বচ্ছ নীলাকাশের উদার বিস্তার দেখে গ্রাম শহরে রাজপথ থেকে কানাগলিতে টগবগিয়ে চলে যৌবনের স্রোত। আবাল বৃদ্ধ বনিতা। স্বচ্ছ নীলাকাশে ভেসে থাকা পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘ দেখে উতলা হয় দেহ মন। চারদিকে শুধুই ঝলমলে খুশিঁর ঝিলিক মাখা মানুষের মুখ। কল্পনার আবেগে ডানা ঝাঁপটে মন ছুটে চলে বুঝি কল্পনার বেড়াজাল ডিঙিয়ে অসীম দিগন্তেরও ওপারে! ছোট বেলায় রূপসী শরতের আবির্ভাব লগ্নেই নিজের অজান্তেই লাফিয়ে উঠতো সবার মন। কাশ ফুলের ঢেউ তোলা প্রতীকী শুভ্রতায় সোহাগী প্রকৃতিকে যেন আরও আহ্লাদী মনে হতো। তাই তো শারদোৎসবের উন্মাদনায় পথ চলা মানুষের লহরে একটি মুখচ্ছবিতেও কখনও যে ডড় ভয়ের ছিটে ফোটাও চোখে পড়বেনা!

বাঁধনহারা আবেগ ও আধ্যাত্মিকতার যুগলবন্ধীতে উৎসব পাগল মানুষ মাস ব্যাপী মেতে থাকেন, নতুন পোশাকের কেনা কাটায়। পাড়ায় পাড়ায় সেজে উঠে নান্দনিক শিল্প প্রতিভা ও কারিগরী প্রযুক্তি মিশিলে মহীরূহ পূজা প্যান্ডেল! তবে যাবতীয় চমক বিস্ময়ের মাঝে আধ্যাত্মিকতার খোলস ছেড়ে বহারী চমকে শারদোৎসবকে আজ মনে হয় যেন আলোর অত্যাশ্চর্য উৎসব! বহি:রাজ্যের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। রাজ্যের নিরিখেই এটা বলা যাবে, উৎসবের বাহারী সাজ সজ্জার অন্যতম অঙ্গ অত্যাধুনিক কারিগরী বিস্ময়ের অবদানে পাওয়া চোখ ধাঁধানো আলোক সজ্জা। অত্যাধুনিক সভ্যতায় মানুষের যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কৃষি শিল্প কল কারখানা অফিস আদালত বাড়ি ঘর হাসপাতাল প্রতি মুহূর্তেই চাই বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুতই আজকাল উৎসবে নির্মল আনন্দের অন্যতম শর্ত। যেমনটি দীপাবলীকে আলোর উৎসব তথা দীপ প্রজ্জলনের উৎসব বলা হলেও ভারতের বাঙালী প্রধান অঞ্চলে চাকচিক্যে শারদোৎসব প্রকৃতই যেন আলোর উৎসব। দেখা গেছে প্রতিবছর দুর্গোৎসবের সন্ধ্যায় রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা বছরের সর্বোচ্চ হয়। তবে চলতি বছরের ৭ জুনই রাজ্যে সর্বকালীন রেকর্ড ৩৬২.২ মেগাওয়াট ছুঁয়েছিল দিনের সর্বোচ্চ বিদ্যুতের চাহিদা! তার আগের বছর গুলোতেও পূজার সন্ধ্যায় বিদ্যুতের চাহিদা তিনশ মেগা ওয়াটের অনেক উপরেই ছিল! যেমন ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১সালে রাজ্যে দুর্গোৎসবে সর্বোচ্চ বিদ্যুতের চাহিদা দাঁড়িয়ে ছিল যথাক্রমে ৩০৬, ৩১৪ ও ৩২৬ মেগাওয়াট।একসময়সামাজিক অনুষ্ঠানে কিংবা পূজার আয়োজনে ছিল হ্যাজাক লাইট নির্ভরতা। গ্রাম শহর সর্বত্রই ছিল চোখ ধাঁধানো রঙীন আলোকমালা। আলো এই সময়ের উৎসবের অন্যতম আকর্ষনীয় দিক। প্রযুক্তি বিস্ময়ে আমুল বদলে গেছে আলোকসজ্জা। চার দশক আগেও রাজ্য হ্যাজাকের আলোতেই হতো পূজা। বিদ্যুতের আলো সে তো অনেক পরে। যেখানে রাজ্যের রাজধানী আলো দেখেছিল বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। তাও ছিল শুধু রাজবাড়ী এলাকায়। ১৯৩৭। তখন ত্রিপুরার রাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য। তাঁর আমলেই (১৯২৩-৪৭) হীরা পার্বতী ত্রিপুরা দেখেছিল প্রথম ডিজেল চার্লিত জেনারেটার। বলা যায় আধুনিক ত্রিপুরার বিদ্যুতের গোড়া পত্তন ঘটেছিল সে সময়েই। দীর্ঘ দশকের পর দশক সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখা যেত হ্যাজাকের আলো। সেই হ্যাজাকের আলোতেই পূজা হতো। আরতি। নিরঞ্জন। বিসর্জন। সবই। আসে বৈদ্যুতিক বাল্ব। বড় বাল্ব কিংবা নাইট ল্যাম্পের গায়ে রঙীন প্লাস্টিক মুড়েও তখন বাহারী আলোক সজ্জা। তারপর বাল্ব কিংবা টিউব লাইটের সিরিজে মোটর লাগিয়ে ক্রমিক নেভানো জ্বালানোর মাধ্যমে চমক লাগাবার চেষ্টা। আসে টুনি লাইট কিংবা লিচু লাইট। বিজ্ঞান প্রযুক্তি গবেষনা থেমে থাকে না। দেশে এক এক করে প্রথমে সি এফ এল। তারপর এল এল ই ডি-র আলো। তিন দশক আগে রাজ্যে আসা শুরু বহি:রাজ্যের আলোক শিল্পীদের। প্রতিবছর শারদোৎসবকে কেন্দ্র করেই আসতে লাগলো বাহারী আলোক সজ্জা। যেমন বিখ্যাত চন্দন নগরের আলোক সজ্জা। কারিগরি বিকাশের পিছু পিছু ক্রমশ আসে নানা ধরনের সার্কিটে বিভিন্ন থিম। সম সাময়িক ঘটনাবলী।

শারদোৎসব যেন আলোর উৎসব

— দীপক লোধ
উদয়পুর।

শরৎ মানে দিগন্ত দিশারি নীলাকাশ। যার নিচে চলতে থাকে উৎসব পাগল মানুষের নির্ভয় বিচরণ। বৃহত্তর অংশের বাঙালীর কাছে শরতের মহাকর্ষণই হল পরম্পরার পরম সোহাগের মেগা পার্বন তথা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার শারদোৎসব'। পোশাকী পরিচয়ে দুর্গোৎসব। স্ফটিক স্বচ্ছ নীলাকাশের উদার বিস্তার দেখে গ্রাম শহরে রাজপথ থেকে কানাগলিতে টগবগিয়ে চলে যৌবনের স্রোত। আবাল বৃদ্ধ বনিতা। স্বচ্ছ নীলাকাশে ভেসে থাকা পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘ দেখে উতলা হয় দেহ মন। চারদিকে শুধুই ঝলমলে খুশিঁর ঝিলিক মাখা মানুষের মুখ। কল্পনার আবেগে ডানা ঝাঁপটে মন ছুটে চলে বুঝি কল্পনার বেড়াজাল ডিঙিয়ে অসীম দিগন্তেরও ওপারে! ছোট বেলায় রূপসী শরতের আবির্ভাব লগ্নেই নিজের অজান্তেই লাফিয়ে উঠতো সবার মন। কাশ ফুলের ঢেউ তোলা প্রতীকী শুভ্রতায় সোহাগী প্রকৃতিকে যেন আরও আহ্লাদী মনে হতো। তাই তো শারদোৎসবের উন্মাদনায় পথ চলা মানুষের লহরে একটি মুখচ্ছবিতেও কখনও যে ডড় ভয়ের ছিটে ফোটাও চোখে পড়বেনা!

বাঁধনহারা আবেগ ও আধ্যাত্মিকতার যুগলবন্ধীতে উৎসব পাগল মানুষ মাস ব্যাপী মেতে থাকেন, নতুন পোশাকের কেনা কাটায়। পাড়ায় পাড়ায় সেজে উঠে নান্দনিক শিল্প প্রতিভা ও কারিগরী প্রযুক্তি মিশিলে মহীরূহ পূজা প্যান্ডেল! তবে যাবতীয় চমক বিস্ময়ের মাঝে আধ্যাত্মিকতার খোলস ছেড়ে বহারী চমকে শারদোৎসবকে আজ মনে হয় যেন আলোর অত্যাশ্চর্য উৎসব! বহি:রাজ্যের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। রাজ্যের নিরিখেই এটা বলা যাবে, উৎসবের বাহারী সাজ সজ্জার অন্যতম অঙ্গ অত্যাধুনিক কারিগরী বিস্ময়ের অবদানে পাওয়া চোখ ধাঁধানো আলোক সজ্জা। অত্যাধুনিক সভ্যতায় মানুষের যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কৃষি শিল্প কল কারখানা অফিস আদালত বাড়ি ঘর হাসপাতাল প্রতি মুহূর্তেই চাই বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুতই আজকাল উৎসবে নির্মল আনন্দের অন্যতম শর্ত। যেমনটি দীপাবলীকে আলোর উৎসব তথা দীপ প্রজ্জলনের উৎসব বলা হলেও ভারতের বাঙালী প্রধান অঞ্চলে চাকচিক্যে শারদোৎসব প্রকৃতই যেন আলোর উৎসব। দেখা গেছে প্রতিবছর দুর্গোৎসবের সন্ধ্যায় রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা বছরের সর্বোচ্চ হয়। তবে চলতি বছরের ৭ জুনই রাজ্যে সর্বকালীন রেকর্ড ৩৬২.২ মেগাওয়াট ছুঁয়েছিল দিনের সর্বোচ্চ বিদ্যুতের চাহিদা! তার আগের বছর গুলোতেও পূজার সন্ধ্যায় বিদ্যুতের চাহিদা তিনশ মেগা ওয়াটের অনেক উপরেই ছিল! যেমন ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১সালে রাজ্যে দুর্গোৎসবে সর্বোচ্চ বিদ্যুতের চাহিদা দাঁড়িয়ে ছিল যথাক্রমে ৩০৬, ৩১৪ ও ৩২৬ মেগাওয়াট।একসময়সামাজিক অনুষ্ঠানে কিংবা পূজার আয়োজনে ছিল হ্যাজাক লাইট নির্ভরতা। গ্রাম শহর সর্বত্রই ছিল চোখ ধাঁধানো রঙীন আলোকমালা। আলো এই সময়ের উৎসবের অন্যতম আকর্ষনীয় দিক। প্রযুক্তি বিস্ময়ে আমুল বদলে গেছে আলোকসজ্জা। চার দশক আগেও রাজ্য হ্যাজাকের আলোতেই হতো পূজা। বিদ্যুতের আলো সে তো অনেক পরে। যেখানে রাজ্যের রাজধানী আলো দেখেছিল বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। তাও ছিল শুধু রাজবাড়ী এলাকায়। ১৯৩৭। তখন ত্রিপুরার রাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য। তাঁর আমলেই (১৯২৩-৪৭) হীরা পার্বতী ত্রিপুরা দেখেছিল প্রথম ডিজেল চার্লিত জেনারেটার। বলা যায় আধুনিক ত্রিপুরার বিদ্যুতের গোড়া পত্তন ঘটেছিল সে সময়েই। দীর্ঘ দশকের পর দশক সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখা যেত হ্যাজাকের আলো। সেই হ্যাজাকের আলোতেই পূজা হতো। আরতি। নিরঞ্জন। বিসর্জন। সবই। আসে বৈদ্যুতিক বাল্ব। বড় বাল্ব কিংবা নাইট ল্যাম্পের গায়ে রঙীন প্লাস্টিক মুড়েও তখন বাহারী আলোক সজ্জা। তারপর বাল্ব কিংবা টিউব লাইটের সিরিজে মোটর লাগিয়ে ক্রমিক নেভানো জ্বালানোর মাধ্যমে চমক লাগাবার চেষ্টা। আসে টুনি লাইট কিংবা লিচু লাইট। বিজ্ঞান প্রযুক্তি গবেষনা থেমে থাকে না। দেশে এক এক করে প্রথমে সি এফ এল। তারপর এল এল ই ডি-র আলো। তিন দশক আগে রাজ্যে আসা শুরু বহি:রাজ্যের আলোক শিল্পীদের। প্রতিবছর শারদোৎসবকে কেন্দ্র করেই আসতে লাগলো বাহারী আলোক সজ্জা। যেমন বিখ্যাত চন্দন নগরের আলোক সজ্জা। কারিগরি বিকাশের পিছু পিছু ক্রমশ আসে নানা ধরনের সার্কিটে বিভিন্ন থিম। সম সাময়িক ঘটনাবলী।

আনন্দময়ীর আগমন ও কাঙালীনি কথা

— মনিদীপা কর্মকার
উদয়পুর।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের 'কাঙালিনী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরাসরি দুর্গার আগমন নিয়ে লিখেছেন। আনন্দময়ীর আগমনে, আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে। ধনির দুয়ারে পূজার আবাহন শুনে কাঙালিনী এসেছে ছুটে। অনাথ ছেলেদের কোলে নিবি জননীরা আয় তোরা সব। মাতৃহারা মা যদি না পায় তবে কিসের উৎসব। এই হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসব চেতনা। তিনি শারদীয়া পূজা উৎসবের গুরুত্ব অনুভব করেছেন — মানুষের পারস্পরিক বন্ধনের ভিত্তিতে। তাঁর পূজা, প্রেম, প্রকৃতি ও ঈশ্বর চেতনা — সবই মানুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

আমাদের রাজ্যে আর্থিক-সামাজিক-শিক্ষাগত দিক থেকে সবচেয়ে বেশি প্রান্তিক ও পিছিয়ে থাকা অংশটি হলো সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভিল, শবর, ওঁরাও জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। শারদীয়া উৎসবের আবহে তাঁদের বর্তমান অবস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন করা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা ও ইতিহাস রয়েছে। আমাদের রাজ্যে তাঁদের বসবাস ঐতিহ্যবাহী চা বাগিচা, ইটভাট্টা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত অঞ্চলকে ধরে। ১৯১৬ সালে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য বাহাদুর রাজ্যে চা বাগানের গোরাপত্তন করেন এবং এই বিষয়ে ব্যাপক জমি লিজে দেন। তখন আসাম ও অবিভক্ত বাংলাদেশ হতে বাগিচা শ্রমিক হিসেবে তাঁদের আনা হয়। সেই থেকে ১০৭ বছর ধরে এরাজ্যে বসবাসের ইতিহাস রয়েছে। সরকারিভাবে তাঁরা তপশিলী উপজাতি ভুক্ত। কিন্তু আজও তাঁরা সবাই ভূমিহীন। বাস্তু ও জীবিকার জন্যে কোন জমির অধিকার তাঁরা পায়নি। বাগানের জমিতেই বসবাস ও কৃষিকাজ। এখন বাগানগুলো রুগ্ন। তাই বাগানে কাজ নেই বললেই চলে। কোনরকমে কৃষিকাজ, ধান চাষ এবং ইট ভাঙা, পাথর ভাঙা, রিক্সা চালকের

কাজ একমাত্র ভরসা। ডিজিটাল সভ্যতার যুগে তাঁরা আজ সত্যিই কাঙালিনী। তাঁদের ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্মের কোন কাগজ নেই। বার্থ সার্টিফিকেট নেই। ফলে কোন আধার কার্ড নেই। স্কুলে ভর্তি হতে পারে না। ভর্তি হলেও সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে। জব কার্ড, ব্যাংক একাউন্ট খুবই অল্প সংখ্যকের আছে। কাজের খোঁজে সব যুবকরা বহি রাজ্যে চলে গেছে। কোন গ্রামে গিয়ে আপনি যুবকদের খুঁজে পাবেন না। আর যারা বহি রাজ্য থেকে বাড়িতে এসেছেন তাঁদেরই একমাত্র আপনি বাড়িতে পাবেন। এরকম করুন অবস্থা আর কোনও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পাবেন না। তাছাড়া, ইটভাট্টা শিল্পে ঝাড়খণ্ড হতে ঠিকাদারের মাধ্যমে অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে তাঁরা কাজ করতে প্রতি মরশুমে আসেন এবং তারপর চলে যান। এদের মধ্যে অনেকেই ইটভাট্টা ও তার আশপাশ অঞ্চলে কাজের খুঁজে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এভাবে ১৯৭২ সালের পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এদের বসতি গড়ে উঠেছে। আর ১৯৬৮ - ৬৯ সালে ডুম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে উদ্বাস্তুদের মধ্যে মুণ্ডা, ভিলদের জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরার ফেণী আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় পুনর্বাসন দেওয়া হয়। সীমান্ত অঞ্চলের কৃষি জমি ও উৎপাদিত ফসল সুরক্ষা এর মূল লক্ষ্য। এটি ভারত সরকারের রণনীতি। এটা সত্যি যে, সীমান্তে কাটাতারের বেড়া দেওয়ার আগে পর্যন্ত ফেণী বর্ডারে কৃষি জমি ও ফসল রক্ষা করতেন তীর ধনুক হাতে তাঁরাই। সীমান্তের চোরাকারবারী পর্যন্ত ভয় পায় ও তাঁদের সম্মান করে। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস। তাঁদের সীমান্ত অঞ্চলে যে জমি পুনর্বাসনের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল, এখন সেই জমি থেকে তাঁদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে নির্বিচারে। সরকারি খরচে রাবার বাগান তৈরি করে তাঁদের বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল। এখন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় এই

রাবার বাগানগুলো ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। জনসংখ্যা ও ভোটার হিসেবে তাঁরা প্রান্তিক। তাই শাসকের কাছে তাঁদের কোনও মূল্য নেই। সবচেয়ে বেশী অপুষ্টির শিকার এই সমাজের শিশু, কিশোর, কিশোরী, মা ও বোনেরা। চা বাগানের মালিকরা মজুরির সাথে যে আটা সরবরাহ করেন তা এতো নিম্নমানের যে তা পশু খাদ্যকে হার মানায়। বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েরা সেনিটারি প্যাডের অভাবে বিভিন্ন জটিল রোগের শিকার হচ্ছে। কোনও প্রতিকার নেই। তাঁদের জনপদে পানীয় জল, সেচের জল এর ব্যবস্থা দেখলে যে কেউই আঁতকে উঠবেন। শারদ উৎসব ওদের কাছে কতটা আনন্দবহ এনিয়ে কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়? তাই ওদের মনের কথা, লড়াইয়ের কথা, উন্নত কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা চর্চা ও বিনিময় সবার মাঝে নিয়ে যেতে হবে। যদিও বৃহত্তর মানব কেন্দ্রিক মিলনের অভিমুখে এটি একটি ছোট্ট প্রয়াস মাত্র!

ভারত ভূখণ্ডের অস্ট্রোলয়েড বা অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত আদিবাসী বলতে মূলতঃ কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, খড়িয়া, বীরহড়, শবর, ভূমিজ প্রভৃতি গোষ্ঠীকে বোঝায়। তাঁরাই ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন আদিবাসী। তাঁরা বহুজাতিক ও বহু সাংস্কৃতিক। সাঁওতাল ও মুণ্ডাদের প্রধান দেবতা সূর্য, চন্দ্র ও বন পাহাড়ী। তাঁদের ভাষায় হলো সিঙ বোঙা, চান্দো বোঙা এবং সারাং বুরু। তাঁদের কারো মধ্যেই কোন মূর্তি পূজা নেই। ধর্ম বিশ্বাসে তাঁরা প্রকৃতির পূজারী এবং পূর্বপুরুষ (টোটেম) দের পূজা করে। তাঁদের বিশ্বাস হাঁস-হাঁসালীর ডিম থেকে তাঁদের জন্ম। তাঁরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। ধীরে ধীরে গোত্রের মানুষ যত বেড়েছে 'সারাং বুরু' অর্থাৎ জল-জমিন-জঙ্গল-এর দেবতা তাঁদের বসবাসের জন্য মাটির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

সাঁওতাল ও মুণ্ডাদের বিবাহকে বলে 'বাপলা'। তাঁদের এই 'বাপলা' বিবাহ হিন্দু, মুসলিম কিংবা খ্রীষ্টানদের মতো দুপুরে, বিকালে বা রাতে অনুষ্ঠিত হয় না। তাঁদের বিবাহ হয় পূর্ণিমার চাঁদ অস্ত যাওয়া ও সূর্যের উদয়ের সন্ধিক্ষণে অর্থাৎ ভোরবেলায়। বরকে কাঁধে করে নিয়ে একজন দাঁড়ায় এবং অন্য আরো কয়েকজন মিলে কনেকে বাঁশের টুকরিতে বসিয়ে নিয়ে আসে। তারপর বরের চারিদিকে ঘোরানো হয়।

তাঁদের বিয়ের আসরের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বিয়ের আসরে নাচে গানে ছেলে মেয়ে ও নারী পুরুষ সমানভাবে অংশ নেয়। তা একটি প্রতিযোগিতার জন্ম দেয়। কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষের মধ্যে জয় পরাজয় নির্ধারণ করা হয়। এখানে হাসি ঠাট্টা বা ঠুসাঠুসিতে কেউ কাউকে ছেড়ে দেয় না। এভাবেই বিয়ে সম্পন্ন হয়। কনেকে যে টুকরিতে বসিয়ে আনা হয় সেই টুকরিটা নিয়ে ছেলেরা গান ধরে।

এই আদিবাসীদের জীবনে প্রধান তিনটি উৎসব — ১) ছাটিয়ার বাপলা, ২) সাদি বাপলা, ৩) দিশম বাপলা। আবার বাপলা কথার বিভিন্ন অর্থ। এখানে ছাটিয়ার অর্থ হলো জন্মোৎসব,দিশম বাপলা এর অর্থ হল মৃত্যু উৎসব। তবে সবচেয়ে বড়ো উৎসব হচ্ছে বাহাপরব। অর্থাৎ ফুল পরব। কোথাও এটাকে বলে আতু বাপলা। গ্রাম্য মিলন উৎসব। অপর আরেকটি উৎসবের নাম হচ্ছে 'বন পাহাড়ী'। এই উৎসবে গ্রামের সমস্ত ছেলে মেয়ে, নারী পুরুষ মিলে তিনদিন তিনরাত্র নেচে গেয়ে, পিঠের মধ্যে একটি ঝাণ্ডা নিয়ে প্রকৃতির পূজা করে। তাঁরা গান ধরে — 'ছোড়াছুড়ি খেলে রসিকা, বুড়াবুড়ি খেলে রসিকা, বাঁশ বাড়িতে শিকার খেলায়, হৈ! হৈ! হৈ রে"। দিশম বাপলা অর্থাৎ 'মরা করম' এ আদিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন আচার নিয়ম (টাবু) পালন করতে দেখা যায়। মুণ্ডাদের মধ্যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে এক সম্মিলিত শোকগানের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। তবে এইসব শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে গোষ্ঠী বা গোত্রের মানুষদের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটে এবং একসাথে খাওয়া দাওয়া ও মিলনের মধ্যে দিয়ে সামাজিক ঐক্যের দিকটি প্রতিফলিত হয়।

তাঁদের জন্মোৎসবে তেতো বা নিম পাতা খাওয়া একটি বিশেষ দিক। ভাতের মণ্ডার মধ্যে তেতো মেখে তাঁরা খাবেই। আর এর মধ্যে নতুন শিশুর স্বাস্থ্যের মঙ্গলের জন্য চলে ব্যাপক নেশা পান। ভাতের তৈরি হাড়িয়া। সাঁওতালরা যাকে বলে হাণ্ডি। মুণ্ডাদের ভাষায় বলে 'ইলি'। এভাবে রাতভর চলে নাচ গান। শেষ হয় ভোরের সূর্যোদয়ে।

শাল গাছ ও শাল পাতা, বনের প্রতিটি গাছ গাছালি, জীবজন্তু ও সম্পদ তাঁদের জীবন সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তাই তাঁরা ঐতিহ্যগতভাবে শাল গাছ ও বনসম্পদকে রক্ষা করে। অথচ সভ্যতা এখন জলবায়ু উষ্ণায়ন ও প্রকৃতির রোষানলের মুখোমুখি। তার কারণ প্রকৃতির যথেচ্ছ অপব্যবহার। আর আদিবাসীরা প্রকৃতিবান্ধব, বনবান্ধব। ভূপ্রকৃতি ও সভ্যতার ভারসাম্য ওঁরা অনেকদিন রক্ষা করে আসছেন। প্রার্থনা করি দুর্গা যেন কাঙালীনিদের সব দুর্গতি হরণ করেন। ওঁরা যেন আবহমানকাল প্রকৃতিতে জড়িয়ে আপন কৃষ্টি সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে থাকেন।

মহাকাশ চর্চা দীর্ঘায়িত করুক মানব সভ্যতার আয়ু

— সোমনাথ চক্রবর্তী
ব্যাঙ্গালুরু।

সভ্যতার উষালগ্ন থেকে মানুষ আকাশে তাকিয়েছে অবাক বিস্ময়ে। আকাশের বিশালতায় সে তার কল্পনার ডানা মেলে দিয়েছে, পর্যবেক্ষণ করেছে তারা, গ্রহ-নক্ষত্র। সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র-উল্কাপাতকে ঈশ্বরের অতিপ্রাকৃত সৃষ্টি হিসেবে দেখা শুরু করলেও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ সূত্রে সে ব্যাখ্যা করেছে তাদের গতিবিধি। মানুষ সুদূরের পিয়াসী। অজানাকে জানার কৌতুহল তার অপরিসীম। এই কৌতুহল থেকেই সে পাড়ি দিয়েছে মারিয়ানা সমুদ্র খাতের গভীরতা থেকে মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতায়। অজানাকে জানা এবং অসাধ্য সাধরনের জন্য সে উদ্ভাবন করেছে নানান প্রযুক্তি। মানব অনুসন্ধিৎসার চরম নিদর্শন তার মহাকাশ অভিযানের বিভিন্ন অধ্যায়।

সভ্যতার অন্যান্য যুগান্তকারী আবিষ্কারের মতই মহাকাশ অভিযানের নেপথ্যে রয়েছে রাজনীতি ও সামরিক শক্তির যুগলবন্দী। মহাকাশ অভিযানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রকেট হাজার বছরের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফসল। নবম শতাব্দীতে চীন দেশে গান পাউডার আবিষ্কৃত হয়। সোরা, গন্ধক এবং কয়লা গুড়োর মিশ্রণ গান পাউডারে ব্যবহার করে আতশবাজি প্রদর্শনের সময় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা থেকেই চীনাদের মাথায় আসে ওই পদ্ধতি। বাঁশের নলে গান পাউডার ভরে বিভিন্ন গবেষণা চলতে থাকে। চীনা সামরিক বাহিনী সর্বপ্রথম এরকম গান পাউডার ভর্তি বাঁশের নল তির ও বর্শার গায়ে বেঁধে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। ১২৩২সালে এই অগ্নিবান ব্যবহার করে মঙ্গোল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে চৈনিক সেনা। চৈনিক অগ্নিবাণই আধুনিক রকেটের পূর্বসূরী।

ধীরে ধীরে চীন দেশ থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশে গান পাউডার ও রকেট প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়ে। সপ্তদশ শতকে বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন স্থিতি ও গতিবিজ্ঞানের মূলসূত্রের অবতারণা করেন। রকেটের কার্যপ্রণালী এই সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা গেল। গান পাউডারের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য গবেষণা চলছিল। প্রসঙ্গত ভারতবর্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে রকেট ব্যবহৃত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। মাইসোরের শাসক টিপু সুলতানের সেনাবাহিনীতে রকেট রেজিমেন্ট ছিল। সমকালীন রকেট প্রযুক্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই মাইসোর রকেট। ১৭৯২ সালে তৃতীয় ঈঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে টিপু সুলতানের পতনের পর এই রকেট প্রযুক্তি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়। ইংরেজ প্রযুক্তিবিদের হাতে সেই রকেট আরো উন্নত হয়ে ওঠে। আধিপত্য বিস্তারে এই রকেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

আধুনিক রকেট প্রযুক্তির সূত্রপাত ১৮৯৮সালে। কনস্টাটিন সিওলকোভস্কি (Konstatin Tsiol kovosky) ১৯০৩ সালে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করে মহাশূন্যে রকেট পাঠানোর বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা বলেন। তরল জ্বালানি ব্যবহার করে দূরপাল্লার রকেটের তত্ত্ব তিনিই প্রথম সামনে আনেন। এই মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার জন্য কনস্টাটিন সিওলকোভস্কিকে আধুনিক নভশ্চরণ বিদ্যার জনক (Father of Modern Astronautics) হিসেবে অভিহিত করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকান আবিষ্কারক রবার্ট গডার্ড (Robert H. Goddard) রকেট সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। তিনি রকেটের গতিপ্রকৃতি গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন ১৯১৯ সালে। শুরুতে তিনি কঠিন জ্বালানি ব্যবহার করতেন তাঁর রকেটে। পরে তরল জ্বালানি ব্যবহার করে একটি রকেট প্রস্তুত করেন। কিন্তু সেই রকেট মাত্র বারো মিটার উচ্চতায় পৌঁছতে পেরেছিল। কিন্তু রকেটে তরল জ্বালানির ব্যবহার সেই সময়কার এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। রবার্ট গডার্ড রকেটের গতিপথ সুস্থিত করার জন্য জাইরোস্কোপ ব্যবহার করেছিলেন। রকেটের মাথায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দেখে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আবার প্যারাসুটের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি পুনরুদ্ধার করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। এসব কৃতিত্বের জন্য রবার্ট গডার্ডকে আধুনিক রকেট বিজ্ঞানের জনক (Father of Modern Rocketry) বলা হয়।

সেই সময় আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে রকেট সংক্রান্ত গবেষণার জন্য অনেক সংস্থা গড়ে

ওঠে। জার্মানির এমনই একটি অ্যামেচার সংস্থা V-2 নামের একটি রকেট প্রস্তুত করে। এই রকেটে অ্যালকোহল আর তরল অক্সিজেন ব্যবহৃত হতো জ্বালানি হিসেবে। V-2 রকেটের প্রধান ডিজাইনার ছিলেন ওয়ার্নার ভন ব্রাউন (Wernher von Broun)। হিটলারের নাৎসি বাহিনী দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে এই রকেট ব্যবহার করে মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর ওয়ার্নার ভন ব্রাউন অন্যান্য প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। V-2 রকেটের অনেক যন্ত্রাংশ নকশা ইত্যাদি আমেরিকার হস্তগত হয়। একইভাবে মিত্র শক্তির আরেক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সোভিয়েত রাশিয়াও V-2 রকেটের অনেক যন্ত্রাংশ এবং কিছু প্রযুক্তিবিদকে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। জার্মানির পরাজয়ের পর আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়া দুই মহাশক্তি হিসেবে উঠে আসে। আমেরিকা পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থার প্রতিভূ আর সোভিয়েত রাশিয়া সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থার প্রতিনিধি। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-শিল্প-সাহিত্য সর্বত্রই নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার লড়াই চলতে থাকে এই দুই দেশের মধ্যে। মহাকাশও এই দুই মহাশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের আখড়া হয়ে ওঠে।

১৯৫৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়া স্পুটনিক -১ কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠায়। চার বছর পর ১৯৬১ সালে ইউরি গ্যাগারিন ভস্তক-১ মহাকাশ যান চড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। এদিকে আমেরিকাও ১৯৫৮ সালে এক্সপ্লোরার নামক কৃত্রিম উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপন করে। ১৯৬১ সালে আমেরিকান নভোশ্চরী অ্যালন শিফার্ড (Alan Shepard) মহাকাশযানে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। ১৯৬৯ সালে আমেরিকার মহাকাশচারী নীল আমস্ট্রং চাঁদের মাটিতে পা রাখেন। এই চন্দ্র অভিযানে স্যাটার্ন -৫ রকেট ব্যবহৃত হয়েছিল যার ডিজাইনার ছিলেন আমেরিকার হাতে আত্মসমর্পণ করা নাৎসি বিজ্ঞানী ওয়ার্নার ভন ব্রাউন। ইতিহাসের এক অদ্ভুত চরিত্র এই ওয়ার্নার ভন ব্রাউন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর ডিজাইন করা রকেট লন্ডন এবং ইউরোপের অন্যান্য শহর ধ্বংস করেছে। তাঁর একই আবিষ্কার মানবজাতির প্রতিনিধিকে চাঁদে পাঠিয়েছে। বিজ্ঞানের বিধ্বংসী এবং মানব কল্যাণকারী দুটি দিকই তাঁর হাতে উন্মোচিত হয়েছে।

সফল চন্দ্র অভিযানের মাধ্যমে মহাকাশে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরেও আমেরিকা এবং সোভিয়েত রাশিয়া বেশ কিছু মহাকাশ অভিযান চালায়। ধীরে ধীরে শীত যুদ্ধ ও মহাকাশ দৌড় (Space Race) স্থিমিত হয়ে আসে, মহাকাশে দুই মহাশক্তির সহযোগিতার যুগ শুরু হয়। আমেরিকা এবং রাশিয়া (তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে) ১৯৯৮ সালে একসঙ্গে মহাকাশ স্টেশন তৈরি করার কর্মসূচি গ্রহণ করে।

এইদিকে ভারতবর্ষে মহাকাশ গবেষণার বীজ বপন হয়েছিল স্বাধীনতার সময়েই। ডক্টর বিক্রম সারাভাই মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণার জন্য ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি স্থাপন করেন আহমেদাবাদে। এই ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি ভারতবর্ষে মহাকাশ গবেষণার আঁতুড় ঘর। এই মহাকাশ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সে বিষয়ে উদোগী হওয়ার পরামর্শ দেন বিক্রম সারাভাই। ভারতবর্ষে মহাকশ চর্চা দেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি সাধনের জন্যই যেন হয় সে বিষয়ে প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিলেন তিনি।

আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়া; ঠান্ডা যুদ্ধের যুযুধান দু'পক্ষের সহায়তায় ধীরে ধীরে সাবালক হতে থাকে ভারতীয় মহাকাশ চর্চা। এই উদ্যোগে পদার্থবিদ, বিজ্ঞান সংগঠক এবং ভারতবর্ষের পারমাণবিক কর্মসূচির তৎকালীন প্রধান হোমি জাহাঙ্গীর ভাবাকে পাশে পেয়েছিলেন তিনি। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় পারমাণবিক কর্মসূচির শাখা হিসেবেই কিন্তু প্রথম মহাকাশ সংস্থা শুরু হয়েছিল। ১৯৬২ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ (INCOSPER) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৯ সালে স্থাপিত হয় ইসরো (ISRO)। ইসরোর মূল উদ্দেশ্য দেশের উন্নতিতে মহাকাশ প্রযুক্তির ব্যবহার। ১৯৭১ সালে সারাভাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুর পরে প্রফেসর সতীশ ধাওয়ান ইসরোর হাল ধরেন। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে ধীরে ধীরে সাবালক হয়ে ওঠে ইসরো তথা ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং পূর্ব-সতর্কতা, কৃষি ও বনজ সম্পত্তির পর্যবেক্ষণ, নগর পরিকল্পনা, মানচিত্র নির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের জন্য নানা রকম স্যাটেলাইট প্রস্তুত করেছে ইসরো। নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্যাটেলাইট স্থাপন করার জন্য পি.এস.এল.ভি.,

জি.এস.এল.ভি ইত্যাদি বিভিন্ন রকেট ডিজাইন করা হয়েছে। শুধুমাত্র নিজের দেশেরই নয়, বাণিজ্যিক ভাবে অন্যান্য দেশের স্যাটেলাইট কক্ষপথে স্থাপন করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে ইসরো।

চন্দ্রযান-৩ মিশন নিঃসন্দেহে ইসরোর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ২০০৮ সালে ইটের আকারের একটি বাক্স (যার পোশাকি নাম (Moon Impact probe) চাঁদের কুমেরু অঞ্চলে ছুড়ে ফেলে ভারতবর্ষের চন্দ্র অভিযান শুরু হয়েছিল (চন্দ্রযান-১)। (Moon Impact probe) থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে চাঁদের বুকে জলের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছিল। এরপর ২০১৯ সালে চন্দ্রযান-২ পাঠানো হয় যা চন্দ্রপৃষ্ঠে নিয়ন্ত্রিত অবতরণ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে অবশেষে ইসরো ২০২৩ সালের ২৩শে আগস্ট চন্দ্রযান-৩ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফল অবতরণ করায়। আমেরিকা রাশিয়া ও চীনের পরে ভারতবর্ষ চতুর্থ দেশ যে চাঁদে সফল অবতরণ করেছে। ভারত নেমেছে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে। গহ্বর এবং প্রস্তরখন্ডের আধিক্যের কারণে দক্ষিণ মেরুতে অবতরণকারী প্রথম দেশ ভারতবর্ষ। চন্দ্রযানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র চাঁদের মাটির তাপমাত্রা পরিমাপ করেছে, চাঁদে ভূ-কম্পনের তীব্রতা মেপেছে, চাঁদে সালফার সহ অন্যান্য বিভিন্ন মৌলের উপস্থিতি প্রমাণ করেছে। চন্দ্র যান -৩ ভারতবাসীর জন্য ''অ্যাপোলো মোমেন্ট'' -সেই মহেন্দ্রক্ষণ যা জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চার করেছে নতুন আশা। দেশের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী অনুপ্রাণিত হয়েছে চন্দ্রাভিযান থেকে। তারা বুঝেছে অদম্য ইচ্ছা শক্তি যেকোনো বাধা অতিক্রম করতে পারে। ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সফল হবার অনুপ্রেরণা যোগাবে এই চন্দ্র বিজয়; শতবর্ষের হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে উৎকর্ষতার সন্ধান করতে উৎসাহ দেবে।

চাঁদের পর সূর্যের দিকেও এগিয়ে চলেছে আদিত্য এল ওয়ান (Aditya L1) নামের মহাকাশযান। পৃথিবী এবং সূর্যের মাঝখানে ল্যাগরাঞ্জ পয়েন্ট (L1 Point) নামক একটি বিশেষ বিন্দুতে অবস্থান করে সূর্যের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে তথ্য পাঠাবে পৃথিবীতে। শুধু ভারতই নয়, পুরো পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা অপেক্ষা করে আছেন আদিত্য মহাকাশ যান থেকে তথ্য পাওয়ার জন্য। সৌর গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এইসব তথ্য থেকে এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

পৃথিবীর বুকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দেশগুলো কিন্তু মহাকাশে আজ একে অন্যের হাত ধরে চলেছে। যা নিঃসন্দেহে মানব জাতির জন্য অত্যন্ত সুখকর। আসলে মহাকাশে গেলেই উপলব্ধি করা যায় যে এই বিপুল বিশ্বে আমরা ধূলিকণা ছাড়া কিছুই নই। পৃথিবীর কলহ যেন মহাকাশ অব্দি পৌঁছে না যায় সে বিষয়ে দেশগুলির রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সচেতন থাকতে হবে। অত্যন্ত ব্যয়বহুল মহাকাশ চর্চা মানবজাতির জীবন উন্নত করুক। দীর্ঘায়িত করুক মানব সভ্যতার আয়ু!

তথ্যসূত্র: ১) নাসার ওয়েবসাইট ২) ইসরো ওয়েবসাইট ৩) বিভিন্ন সংবাদপত্র।

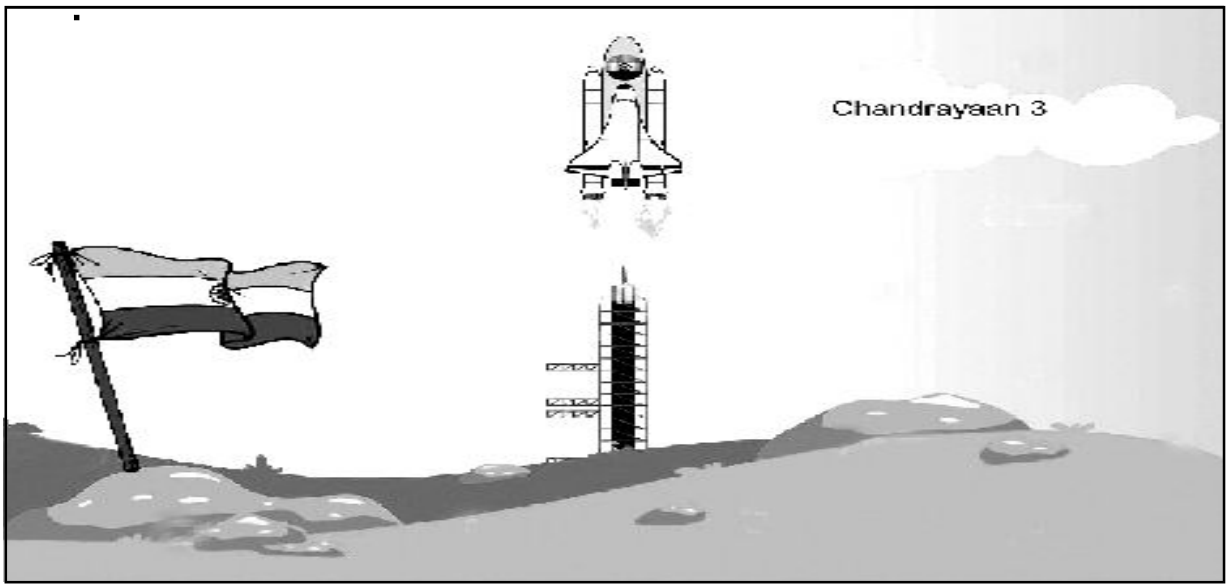

হাজী সাহেব

— অরিন্দম নাথ
আগরতলা।

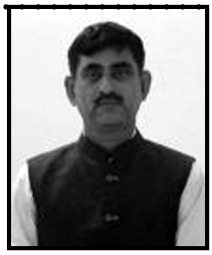

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে আতীত দিনের স্মৃতি। কেউ দুখ লয়ে কাঁদে কেউ ভুলিতে গায় গীতি ... মেঘনাদবাবু প্রথমোক্ত দলে। পঞ্চাশোর্ধ মেঘনাদবাবুর ছোটবেলা কেটেছে গ্রামীণ পরিবেশে। যেখানে কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবী লোকের ভিড়। অনেকেই অশিক্ষিত, কিন্তু দরাজ দিল। তিনি নিজেও জীবনে দারিদ্র দেখেছেন। আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত। বড় চাকুরী করেন। রাজধানীর বাতানুকূল কক্ষে তাঁর অফিসঘর। তাঁর সাথে দেখা করতে হলে, অধস্তনদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। আগে যারা তাঁর চেয়ারে ছিলেন তাদের ক্ষেত্রে কাকে সাহেবের ঘরে পাঠাতে হবে এই নিয়ে অফিসের লোকদের সমস্যা পোহাতে হত না। কিন্তু তিনি জয়েন করার পর প্রায়ই তাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। অনেক স্যুটেট-বুটেট ভদ্রলোককেও সাহেব ঘর থেকে বের করে দেন। আবার কলমিস্ত্রি, অটো-ওয়ালা, সবজি বিক্রেতা অনেকের সাথেই দিব্যি বসে আড্ডা দেন। সময় সবকিছু ঠিক করে দেয়। অফিসের বাবুরাও স্যারের ধাত, আজকাল কিছু হলেও বুঝতে পেরেছেন। ইদানীং বেশি একটা সমস্যা হয় না।

সে যাক গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর ঘরে এসেছিলেন খুর্শেদ মিঞা। অনেক দিন পর। বয়স যাট পেরিয়েছে। অশিক্ষিত। তাঁর একটি ছোট্ট দোকান আছে। মফঃস্বল শহরের ফুটপাথে। এক ছেলে। এক মেয়ে। ছেলেটি পড়াশুনায় ভালো ছিল। তবে স্নাতকের পর আর পড়াশুনা করেনি। একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খুলেছে। আগরতলা শহরে। মোটামোটি দাঁড়িয়ে গেছে। খুর্শেদ মিঞা মাঝে মধ্যে ছেলের কাছে এসে থাকেন। তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অবশ্যই ভুলেন না। দু'জনের পরিচয় দীর্ঘদিনের। চা খেতে খেতে তাঁদের আলাপচারিতা নিম্নরূপ।

--- মাশাল্লা! অনেকদিন পর দেখা। আপনার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে।

— মাশাল্লা! হজ করতে গেছিলাম। দুই মাস খুব কষ্ট করতে হইছে। আমি কয়েকদিন আইয়া গেছি। আপনে ব্যস্ত আছিলেন।

— কই আমারে কয়নাইতো?

— তয় তারার দোষ নাই।

— হজে যেতেতো অনেক টাকা লাগে?

— পাঁচ লাখ খরচ হইছে।

— একজনের?

— না, আমার বিবিও সাথে গেছিল।

— ওয়াকফ বোর্ড থেকে টাকা দেয়?

— না, ট্রেনিং দেয়। প্লেইনে তুইল্যা দেয়। মামা কিছু জমি দিছিল। সেইটা বেইচ্যা দিছি। পুলায়ও কিছু টাকা দিল। তয় কেমন লাগলো?

— মাশাল্লা! মন ভইরা গেছে। খালি মানুষ, আর মানুষ। তিনজনের লাইগ্যা আল্লার কাছে দোয়া মাঙ্গছি।

— কে কে?

— একজন আপনে।

---আমার লাইগ্যা দোয়া মাঙ্গলেন! আমি আপনার কি উপকার করছি?

— আমি আনপড়। আমারে আপনের সামনে বইতে দেন, কথা কন, এই জন্যই আমি কত জায়গায় মান পাই। এতে আমার সাহায্য হয়।

--- আচ্ছা আর কার নামে দোয়া মাঙ্গলেন?

— সেই এমপি সাহেবের নামে। যার কথা আমি আগে কইছি। আমার মাইয়াডারে একটা অর্চাডে চারকী দিছে। ছয় হাজার টেহা বেতন পায়। আমার মাইয়া দেখতে বিশ্রী কইয়া আগে বিয়ার আলাপ আইত না। অহন অনেক পোলায় বিয়া করতো চায়।

— আর?

— আর চাইছি লক্ষীর লেইগ্যা।

— লক্ষী কে?

— তালুকদারের পুতের বৌ। তাইনেরে আপনে চিনেন। রাজনীতি করে। বৌডা বড় দুঃখী। তালুকদারের. বয়স আমার মত। লক্ষীর বাপের বয়স আমনের মত। মাইয়াডারে খালি মারত। শেষে লক্ষীর বাপটা মইরা গেল।

--- মারত কেন? তালুকদারের কি পয়সার আভাব আছে? পুলাওতো ভালো চাকুরী করে। লক্ষী দেখতে কেমন?

— একদম শ্রীদেবীর মত। যেমন লম্বা, তেমন গায়ের রং। এত রূপের জন্যই লক্ষীরে সন্দেহ করে। লক্ষী এখন ভালো আছে। জামাইয়ের সাথে ঘর ভাড়া কইরা থাকে। তালুকদার ভালামানুষ। তালুকদারের বৌডা খারাপ আছিল। বেডি মইরা গেছে। লক্ষী বড় দুঃখিনী।

পরবর্তী কিছুক্ষণ মেঘনাদবাবু নীরব রইলেন। তাঁর একটি গল্প মনে

এল। অসমীয়া ছোটগল্প। অরুণ গোস্বামীর। দুঃখিনীর প্রতি দয়া। একটি ছোট্ট মেয়ে সীমানাকে নিয়ে গল্প। সীমানা গিয়েছিল মার সাথে বিউটি কনটেস্ট আর ফ্যাশন শো দেখতে। প্রায়ান্ধকার হলঘরে সামনের সারিতে বসেছিল। স্বল্পবয়সের সুন্দরীরা নিজেদের সৌন্দর্য জাহির করছিল। বিড়াল পদচারণায়। হলভর্তি দর্শক করতালির মধ্য দিয়ে উৎসাহ যোগাচ্ছিল। যখন পুরস্কার বিতরণের পালা এল, সীমানা একদম মঞ্চের সামনে চলে এল। জামার পকেটে যা কিছু খুচরো পয়সা ছিল মঞ্চের সুন্দরীদের দিকে ছুঁড়ে দিল। সীমানার আচরণে অনুষ্ঠানের ঘোষিকা অপরিসীম প্রীতি অনুভব করলেন। তিনি ছোট্ট সীমানার একটি ইন্টারভিউ নিলেন।

—তুমি কেন পয়সা দিতে গেলে?

— আমার মা সবসময় বলেন দুঃখিনীকে দয়া করতে।

— তারা যে দুখী তুমি কিভাবে বুঝলে?

— কারণ তারা যে কাপড় পড়েনি। দেখছ না তারা ফাটা কাপড় পরে আছে। জামাও পড়েনি, প্যান্টও ফাটা। দুখী বলেই তো ছেঁড়া কাপড় পরেছে। কাপড় কেনার মত পয়সা নেই! দুঃখিনী। তারা দুঃখী। তুমিও তাই।

তিনি কোথায় যেন সীমানার সাথে খুর্শেদ মিঞার মিল খুঁজে পেলেন।

--- মাশাল্লা! এখন থেকে আমি আপনাকে হাজী সাহেব ডাকব।

আকর্ণবিস্তৃত হাসি মুখে হাজী খুর্শেদ মিঞা বিদায় নেন।

যোগমায়া আলো

নন্দিতা দত্ত
আগরতলা।

উফ মাগো, বলেই বিন্তি একদম বসে পড়ে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছিল অসহ্য ব্যথায়। পায়ের বুড়ো আঙ্গুল বড় গাছের শেকড়ে জড়িয়ে গেছে। রোজ এ পথ দিয়েই রাবার বাগানে যায়, ফিরে আসে। কিন্তু কখনো এরকম হয়নি। বিন্তির খুব মায়ের কথা মনে পড়ছিল। এমন পড়ে গেলে মা সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে ব্যাথার জায়গায় হাত ছুঁয়ে দিলে ব্যাথাটা যেন অর্দ্ধেক ভালো হয়ে যেত।

''কোথায় লাগলো দেখি দেখি! এমন নেচে নেচে হাঁটলে হোঁচট তো খেতেই হবে। কতবার বলি দেখে চল। কথা শুনিসনা। এবার সাবধানে হেঁটে ঘরে যা। গিয়েই চুন হলুদ লাগাবি''।

চুন হলুদ লাগাবি বললেই হলো। কে চুন হলুদ গরম করে দেবে। বিন্তির কি সময় আছে? সারাদিন কত কাজ। ফিরে ফিরে আসে সেই সব দিনগুলো। সেই দিনগুলো-তে একাদশে পড়তো।

সাইকেলে যাতায়াতে ঠাকুরপাড়ার বাড়ি থেকে বিন্তির মেলাঘর স্কুলে আসতে ২০ মিনিটের মত সময় লাগতো। বাবা সঙ্গ দিতেন পাশাপাশি আরেকটি সাইকেলে। তবে বাড়ি ফিরে আসা একা হলেই দু-একজন আড়াল থেকে সিটি মেরে পালিয়ে যেতো। বিন্তির কি হয়েছিল সেদিন মনেও পড়েনা। তবে সাইকেল থেকে নেমে আখ ক্ষেতে ছুটে গিয়ে আখটাকে মাথার চারপাশে লাঠির মতো ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটছিল। তারপর দপ করে মাথার আগুনটা নিভে যায়। চোখের সামনে একঝলক মায়ের আঁচলকে উড়তে দেখে। শিস দেওয়া পাখিগুলো আড়ালেই চলে গেল। শান্ত ধানের ক্ষেতের আলে বিন্তির পায়ের আঙ্গুলের ছাপ।

সেদিনের কথা মনে হতেই পায়ের আঙ্গুলের ব্যাথায় মায়ের স্নেহের পরশ। কানে কানে চুন হলুদের রেমেডি। কে বলেছে তোমায় আসতে? আসবেনা। এলেও ছুঁতে পারিনা। এটা জীবন? গাছের শেকড়ে পা আটকানোর পর থেকে সাইকেলে প্যাডেল মারতে পারেনা। বাবাকে আড়াল করে কালভার্টে চলে এসেছে। বিষাদ উদ্‌যাপনে তার একান্ত নিজেকে নিজের সময় দেওয়া।

সন্ধ্যের গোধূলি আলোয় তালগাছের সংসারে বাবুইয়ের ফিরে আসা নারকেল গাছে কটা কাক ফিরছে দেখতে দেখতেই তুলসী মঞ্চে ঠাম্মাকে পায় পিতলের ধূপধারে ধূপের ধোঁয়ায় সর্ষে ছিটিয়ে কৃষ্ণকে স্মরণ করছে।

বাবা তাকে দেখেই বলে, মা'রে আজকে তো জন্মাষ্টমী কিছু ব্যবস্থা করবিনা? বাবার কথা শুনেও বিন্তি যথাসম্ভব চুপ থাকে। জন্মাষ্টমী যোগমায়ার জন্মদিন। কিন্তু যোগমায়া কত আয়ু পেয়েছিল তাতো জানা নেই। যোগমায়ার কথা ঠাম্মা বলেন। যোগমায়াকে আড়াল না করলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হতোনা, কখনোই হতোনা। কেন হতোনা? যোগমায়া যে তার মায়েরও নাম। কি হিসাব মেলায় বিন্তি? জন্মাষ্টমীতে এক যোগমায়া আলো দেখলো আরেক যোগমায়া অন্ধকার।

চুপচাপ এক কল্পনার কল্পতরু হয়ে ওঠা হয়না বিন্তির। ফিরে যায় একাদশ ক্লাসে। আয় আয় তই তই প্যাক প্যাক। ছ জোড়া হাঁস হাঁসির মালকিন তাদের খুদ কুড়া দেবেন। আবার আয় আয় তই তই প্যাক প্যাক। সারাদিনের টিপ টিপ বৃষ্টির জলে তাদের ঘরে ফেরার তাড়া নেই। তাদের খোয়ারে তুলে দিয়ে তবে তো তিনি অন্যকাজে যাবেন। অন্যকাজ আজ বেশ ঝক্কির। দুপুরেই চুন জলে তাল ভিজিয়ে রেখেছেন। তালের রস বের করে পিঠা পায়েস বড়া বানাতে ঘন্টা চারেক। বৃষ্টি ভেজা শরীরে শাড়ি লেপ্টে আছে। হাঁসেদের সংসার না গুছিয়ে ভেজা শাড়ি পাল্টে আবার ভিজতেই হবে। হাত পা কোমড় মাঝে মাঝে মনে করায় - অবহেলা করোনা।

বিন্তি অপেক্ষায় পায়েসের বাটি নিয়ে মা ঠাম্মা প্রদীপ সাজিয়ে চন্দন বেঁটে বসবেন। তাকে আসন পেতে বসিয়ে ধানদুব্বা মাথায় ছুঁয়ে বুকে জড়িয়ে ধরবে। পায়েস পর্ব শেষে কেক কাটা। তাই বাবা পেছন থেকে ছোট কেক হাতে নিয়ে কখন যে দাঁড়িয়েছেন তা বিন্তি খেয়ালই করেনি। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ব্যাঙেদের একটানা রেওয়াজের মাঝে ঝিঁঝিঁর গান, সাথে জোনাকির রঙমশাল আলোয় জন্মদিন উদ্‌যাপন শেষে মা ঠাকুমা যখন তালের পিঠা পায়েসে ব্যস্ত বাবা তখন খিঁচুড়ি রান্না করলেন।

তাল পর্বেই মায়ের কাশি শুরু। রাতে জ্বর উঠলো বেশ। জ্বরের ঘোরেই মাঝরাত থেকে কাতরাতে শুরু করলো। বিন্তি কাঁথা দে, বিন্তি বড় শীত। বিন্তি কাঁথা চেপে মাকে জাপটে ধরে শুয়ে রইলো। এত রাতে বাবা বা ঠাম্মা কাউকে ডাকেনি। নিজেই জল ফুঁটিয়ে

আদা মধু মিশিয়ে গরম গরম চায়ের মতোই চুমুক দিয়ে খেতে বললো। এই রাতে তো শিউলি পাতা গাছ থেকে এনে রস করা যাবেনা। সকালেই ব্যবস্থা হবে। মায়ের একটু ঠাণ্ডা কমতেই, মা ঘুমিয়ে পড়লো। বিন্তির চোখে ঘুম নেই। কয়েকদিন শুনছে একটা বাজে ধরণের জ্বর হচ্ছে। শরীর খুব দুর্বল হয়ে যায়। অনেকে মারা গেছে। মশা কামড়ালে এ জ্বর হয়। বিন্তিদের ঘরে তেমন মশা নেই তবে দাওয়ায় বসলে মশা খুব জ্বালায়। একটা গোঙানি শুনে বিন্তির আধো আধো ঘুম কেটে যায়। মা বিন্তিকে কিছু বলে কিন্তু বিন্তি বুঝতে পারেনা।

ভোরবেলা মায়ের পাশে শুয়ে বিন্তি ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে টের পায় ঠাম্মা ডাকছে। বিন্তি চমকে তাকিয়ে দেখে মা গভীর ঘুমে। আলতো হাতে মাথায় হাত রেখেই কেমন যেন লাগে। ঠাম্মা মায়ের খুব ঠাণ্ডা লাগছিলো। আমি আদা মধু দিয়ে গরম জল দিয়েছি। মা যেন কি পাতার কথা বলছিল রস খেলে শরীর ঠিক হবে।

এতক্ষণ বাবা চুপচাপ ছিল। মায়ের গায়ে হাত দিয়ে বলে হাসপাতালে নিতে হবে। আলপথ ধানক্ষেত ভরা বাড়ি থেকে ঐ সকালে হাসপাতালে নেওয়া সোজা কথা ছিলনা।

বিন্তি শান্ত মনে মায়ের শেষ কথাটা মনে করার চেষ্টা করে। হঠাৎ দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে পুকুর পাড়ে হাঁটতে থাকে। মেলাতে পারেনা কোন পাতা। অথচ মনে হচ্ছে এগুলোর মধ্যেই আছে। হাসপাতালে নিয়ে যেতে বেলা হয়ে গেলেও কিছু মিরাক্যাল ঘটলো না।

বাড়িতে মধ্য দুপুরে একমাথা সিঁদুর পরিয়ে দিলেন বাবা। বিন্তি চিৎকার করেনি। কেঁদেছে নিভৃতে। একাদশ পেরিয়েছে তারপর আরো কয়েক ধাপ। বিন্তি প্রতিদিন একবার পুকুরের চারপাশে হাঁটে। লেপ্টে যায় মায়ের আঁচলে। গন্ধটা অনুভব করে। যা কেউ বোঝেনা। অনুভব কি বলে কয়ে বোঝানো যায়!

মা খুব জানতে ইচ্ছে করে যোগমায়া আলোর কথা। যোগমায়া আলো তো তুমি। তোমার আলোতেই রাস্তা দেখি। কত কথা মা। মাঝে মাঝে বলতে একটু চুপ করে থাক। নীরবতার ভাষা আছে বোঝার চেষ্টা কর। মা তুমি স্কুলের গণ্ডি না পেরিয়েও কি করে বলতে এসব। তুমি কি করে বুঝতে! কেন বলতে সব কিন্তুর জবাব হয়। সব সৃষ্টির পেছনে ধ্বংস ও থাকে আবার তা থেকে নতুন করে জানা থাকে। সব প্রশ্নে পৃথিবী থেমে থাকেনা উত্তর প্রতি উত্তর থাকে। তোমার কথা মেনেই সব মিলিয়ে দেখি একটার পর একটা। খুঁজতে হয়, যে খোঁজে অন্বেষণ থাকে সেখান থেকেই উত্তর আসে।

সেই জ্বরের রাতে যে পাতাটার কথা বলেছিলে নামটা বুঝিনি। অস্পষ্ট জড়ানো জিভে বলেছিলে কালচে সবুজে সাদা কাঁথার মতো সেলাই। সেটা খুঁজে এনে রস করে তাতে একটু আদার রস আর কাঁচা লঙ্কার গন্ধে গরম করে খেলে জ্বরটা ছেড়ে যাবে। বিশ্বাস করিনি। প্রায় এক সপ্তাহ পর গিয়ে পুকুর পাড়ে খুঁজে পাইনি। অথচ ছয় মাস পরে এ গুল্মে পুকুর পাড় সাজলো। বাবার সেই কাঁপুনি দেওয়া জ্বরে তোমার বলা মতো পাতার রস তৈরি করে বাবাকে দিলাম। তিনদিনে বাবা উঠে দাঁড়ালো। এখন আমাদের বাড়ি থেকে অনেকেই নিয়ে যায়। বোটানির ছাত্রী আমি। স্যারকে নিয়ে দেখালাম। ল্যাবে স্যার এই পাতাকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় আছেন। মা তুমি বলতে প্রকৃতিতেই সব। একটু জানতে হয় চিনতে হয়। প্রকৃতি হয়ে তুমি আছো। আমি এখন নীরবতা উদ্‌যাপন করি ক্ষেতের আলে বা বিশাল বটগাছটাকে দেখে। মা কথাতেই সব কিছু আবার নীরবতাতেও আরো অনেক কিছু। মা তোমার বিন্তিকে ঠাম্মা বলে, জেঠু, জ্যামা বলে বোঝায় কত কথায় জীবনের ধাপের কথা। বিন্তি কি বোঝেনা! বোঝে মা। কিন্তু বিন্তির অতসব কথায় আর মন ভরেনা। বুকের ভেতর চিনচিন ব্যাথায় মাকে জড়িয়ে ধরতে চায়। মাগো একটু এসে পাশে বসো।

মা জানো কালভার্টে বসে যখন ডুবন্ত সূর্যের সাথে চোখাচোখির খেলা খেলছিলাম কে যেন ডাকলো। এদিক ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। পায়ের ব্যাথাটা থাকুক তাহলে তুমি ছুঁয়ে থাকবে। বাবা আজকাল খুব ভয় পায়। একটু কেটে গেলেই গাঁদা ফুলের পাতা ছিড়ে হাতের তালুতে চেপে রস বের করে লাগাতে বলেন। তখন বাবা কেমন করে যেন মা হয়ে যায়। কথাগুলো শুনি ঘোরের মত। ঘাড় ঘোরানোর মুহূর্তে সূর্যকে বগলদাবা করে নিল মেঘেরদল। না মন খারাপ হয়নি তখন। আজকাল আমার মন খারাপ হয় না। বিষাদ যে অন্য এক উদ্‌যাপন এটা অনুভব করি।

সেদিন জন্মদিন। বছর ষোলর ছোট হারিয়ে ফেলা একটা দিন জন্মদিনকে পেছনে ফেলে দিয়েছে।

জন্মাষ্টমী, জন্মদিন আর যোগমায়া আলো! এই যোগমায়া আলোটা কি আমি কাউকে বোঝাতে চাইনা। যে জোনাকি আলোয় মিশে যোগমায়া আলো বেগুনি ছটায় প্রতিভাত সেখানেই আছো, তাও হয়ে গেছে অনেক দিন। জোনাকি আলো না যোগমায়া আলো কোন আলোয় বিন্তি ভেসে যাচ্ছে।

জোনাকি আলো না মমতামাখা যোগমায়া আলো তাকে ছুঁয়ে আছে বিন্তি বুঝতে পারেনা। একটা অদ্ভুত আবেশ গোলাকার হয়ে তাকে ঘিরে রেখেছে। সেই আলোর রং হলুদ থেকে কমলা, মেরুন, ঘন নীল হয়ে ক্রমশ মিলিয়ে গেল। আস্তে আস্তে সোনালী আলোর ঢেউয়ে বিন্তি যেন আলোবিছনো আলপথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে!

ঝিন্টির শেষ চিঠি

— শুভাশিস চৌধুরী
আগরতলা।

রূপু!

এই চিঠি যখন তোর হাতে পৌঁছবে, তখন তুই হয়তো আমাকে দেখতে চাইবি। কিন্তু বিশ্বাস কর আমি হয়তো তোকে ফিরিয়ে আনতে যেতাম। কিন্তু হলো না। অনেক ভেবে এক নার্স দিদির দেয়া কাগজ কলম নিয়ে চিঠিটা লিখব ভাবলাম এই হাসপাতালের বেডে বসে। কী লিখব? কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না, তুই আমার সঙ্গে, আমারই সঙ্গে এমনটা করবি! না হয় হঠাৎ করে পাওয়া নেশায় একটা ভুল হয়েই গেল, না হয় তুই আমাকে জোড় করে তোর কাছে টেনে নিলি। না হয় তুই আমাকে উলটে পালটে চেখে নিলি।

হয়তো এমনটাই হতো তোর আমার মধ্যে। সেটাই তোর আমার ইচ্ছেতেই একটা শাঁখ বাজানোর পর। তাহলেও কি তুই আমাকে একলা ফেলে ঘর থেকে পালিয়ে যেতি? যেমন আজ ফেলে গেলি ঘনবসতির জঙ্গলে?

এইখান থেকে যখন আমাকে কতগুলো অচেনা মানুষ এই হাসপাতালের বেডে নিয়ে এলো, তখন তো আমার কথা বলার মতো শক্তি নেই। শুনেছি তোকে থানায় নিয়ে গেছে। কী আর শাস্তি দেবে!

তোর শাস্তি তো দিতাম আমি নিজের হাতে। আমি তোকে জড়িয়ে রাখতাম আজীবন। তোর কোনো দোষ নেই আমি মানি, এ এক মুহূর্তের বালখিল্যতা। আমি থানাবাবুকে গিয়ে বলতাম তোর কোনো দোষ নেই, আমি তোকে বাধ্য করেছি আমার সঙ্গে সহবাসে। আমি এটাও বলতাম, সঙ্গের লোকগুলো ওর অজানা, ওদের এই কামনার কথাও বুঝতে পারেনি। আমি বুঝতে পেরে যতটা পেরেছি, লড়েছি। আমরা দুজন দুজনকে ভালবাসি। বলতাম তোকে ছেড়ে দিতে।

তারপর সেখান থেকে এসে তুই হয়তো আমাকে নিয়ে যেতি এই শহর থেকে অনেক দূরে। হয়তো সেখানেই হতো আমাদের বাকি যাপন। তুই আর আমি যেটুকু পড়াশুনা করেছি, পড়াশুনা ছাড়াও যেটুকু মোবাইল সারাইয়ের কাজ থেকে গাড়ি চালানো পর্যন্ত শিখেছিস তুই, তা দিয়ে দুজনের জীবন তো চলে যেত। এইটুকুই তো চাওয়া। শুধু একটু সময়ের অপেক্ষা মাত্র ছিল।

কী করলি তুই? তুই জানিস! তুই আমার সঙ্গে যা করেছিস তার থেকেও বেশি জোর করে নিঙড়ে আমাকে, আমার মা-বাবাকে ধর্ষণ করেছে অসংখ্য ক্যামেরার লোক? হাসপাতালের বেডে আমার সঙ্গে থানার লোক, আর খবরের নামে অগুণতি মানুষ মোবাইলের সামনে রগরগে সব প্রশ্ন করে যে একটা ছবি বানিয়ে সাড়া বিশ্বের দরবারে হাজির করেছে সে কি আর মুছে যাবে?

এই দৃশ্য সেদিনের সেই ঘটনার থেকেও বিভীষিকাময়। যার রেশ এ জীবনে মুছবে না। এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, তুই ভালোবাসার নামে আমাকে বিক্রি করে দিবি। তুই কী বললি! ওরা তোকে অনেক টাকা দেবে, যা তোর-আমার ভবিষ্যতের জন্য দরকার। তুই বুঝতে পারিস নি ওরা এমন কাজ করবে। এই কথাগুলো শুনে একরাশ ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই তোর জন্য রইলো না। এটাই সত্য, প্রমাণিত। আজ থেকে কোনো মেয়ে হয়তো আর এমন বোকার মতো ভালোবাসবেনা — শুধুমাত্র রূপে পাগল হয়ে কোনো রূপুকে।

আজ পাঁচদিন পর হাসপাতালের বাইরে এসে আকাশটা দেখছি। নীল আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ। বাড়িতে যাব বলে একটা রিকশাতে উঠতেই, রিকশাকাকুর করুনাকাতর দৃষ্টি, আমাকে বাড়ির দিকে যেতে বারণ করল। বুঝতে অসুবিধা হলো না এবার লড়াই আমার একার। জেনে রাখিস সব মেয়েদের মধ্যেই একটা দুর্গা লুকানো থাকে। তাই চললাম। কোথায় যাব জানি না.....?

তোকে জানাব ভেবে এই কথাগুলো মনের দেয়ালে লিখে রাখলাম।

আমি তোর নই
আমি ঝিন্টি?
২৭শে আশ্বিন, ১৪৩০।